বালিকা বধূ

বিমল কর

বালিকা বধূ

বিমল কর

কয়েক মাস আগে 'বালিকা বধূ' দেশ পত্রিকায়
প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়
কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটি
দীর্ঘ কাহিনী, উপন্যাস নয়।

বিমল কর
৩-১২-'৬৫

১
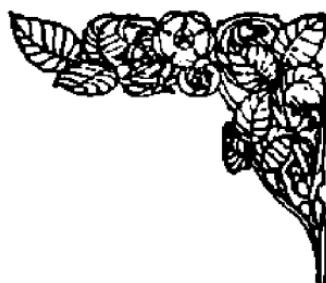
কাহিনীটি কিঞ্চিৎ পুরাতন। সময়ের দিক হইতে ইহাকে তিনযুগ পূর্বেকার বলা যায়। রাজা পঞ্চম জর্জের মাথার ছাপঅলা টাকার চল তখন, আমাদের কৈশোরকাল। সেকালের টাকা অবশ্য একালে অচল, বোধ করি এই পুরাতন গ্রাম্য কাহিনীটিও এখনকার দিনে আর চলে না। তথাপি লিখিতে সাধ জাগিল।

আমার পিতা স্বর্গত শশধর সিংহ মহাশয় মানুষটি অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলেন। আচারে বিচারে তাঁহাকে অন্য পাঁচজনার সহিত এক করিবার উপায় ছিল না। তাঁহার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন, আকৃতিটিও দেখিবার মতন: উচ্চতায় ছয় ফুট: প্রস্থে, অনুমান করি, চার ফুট বেড়। পিতামহাশয়ের হস্ত দুটি যথেষ্ট দীর্ঘ

এবং মেরুদণ্ডটি সবল সরল ছিল; গাত্রবর্ণ পাকা বেলফলের ন্যায়। পুরুষের কেশচর্চাকে তিনি নারীসুলভ আচরণ বলিয়া মনে করিতেন, এবং নিজ ধারণার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁহার মস্তকে একগুচ্ছ কেশও বাড়িতে দিতেন না। আমাদের বাড়ির বাঁধা নাপিত ছিল, সে প্রত্যহ সকালে পিতামহাশয়ের ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করিত, এবং প্রতি রবিবার 'সান রাইজ' খুরে পিতার মস্তক মুণ্ডন করিত। প্রয়োজনে তিনি মাথায় সাদা পাগড়ি পরিতেন। খুবই আশ্চর্যের কথা, কেশের প্রতি পিতা-ঠাকুরের অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও তাঁহার মুখ-মণ্ডলে একটি তেজীয়ান মোচ ছিল। তিনি গুম্ফ-রক্ষাকে পুরুষধর্ম বলিয়া মনে করিতেন।

আমার পিতা উপবীত ধারণ করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন জাতিতে রাজপুত। আমার পিতামহ নানা কারণে দেশ বাড়ি, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া বাঙলা দেশে চলিয়া আসেন। বাঙলা দেশের যে-প্রান্ত বর্ধমান জিলার আর্দ্র আবহাওয়া, সজল-শ্যামলতা হারাইয়া ক্রমশ রুক্ষ ও লাল হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে অবারিত মাঠ, পলাশ ও বন-খেজুরের ঝোপ, কয়লাকুঠির জ্বলন্ত চুল্লি—পিতামহ সেই স্থানে স্থানীয় আঘোরী, চট্টরাজ, পংখী, সাহানা, মাঝি প্রভৃতির সহিত মিলিয়া-মিশিয়া সেই সমাজে এক হইয়া গেলেন। আমাদের নিজস্ব কতিপয় আচার-

আচরণ অন্তঃপুরে কিছুকাল বজায় থাকিলেও ক্রমে তাহা প্রায় লোপ পাইল। আমরা সর্বপ্রকার সামাজিক কর্মে শিক্ষাদীক্ষায় বাঙ্গালী সমাজের অনুবর্তী হইয়া গেলাম। আমার মাতা-ঠাকুরানী স্থানীয় এক বাঙ্গালী কুঠি-গোমস্তার কন্যা ছিলেন। তিনি সুশ্রী ও লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়াই বোধ করি তাঁহার নাম ছিল লক্ষ্মী।

আমার পিতামাতার তিনটি সন্তান। আমিই জ্যেষ্ঠ পুত্র; আমার ভগ্নী চন্দ্রা আমার পিঠ-পিঠ, ব্যবধান বৎসর দেড়েকের। কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি আমাদের অপেক্ষা ছয়-সাত বৎসরের ছোট ছিল। পিতামহাশয় চিরটাকালই তাহাকে 'ধর্মরাজ' বলিয়া ডাকিয়াছেন। ভ্রাতাটির ধর্ম-রাজ হইবার বিশেষ কোনো লক্ষণ তাহার জন্মলগ্নে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু সে যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন পিতাঠাকুর নিজ ঘরে বসিয়া মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব পাঠ করিতেছিলেন, দুইটা হুলো বিড়াল বাহিরের বারান্দায় পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া তর্জনগর্জন করিতেছিল; কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মগ্রহণের সংবাদে মহাভারতটি বন্ধ করিয়া পিতাঠাকুর সদ্যোজাত পুত্রকে ধর্মরাজ নামে অভ্যর্থনা করিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার পিতা অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ঠাকুর দেবতায় দুর্বলতা বোধ করি তাঁহার ছিল না, পূজার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না, অঞ্জলি দিতেন না;

অথচ ধর্ম্ম ও সামাজিক আচরণে তাঁহার নিষ্ঠা ছিল। প্রত্যহ স্নানশেষে সূর্যমন্ত্র আবৃত্তি করা এবং রাত্রে মহাভারত, গীতা প্রভৃতি পাঠ তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি বিদ্যাসাগরের বড় ভক্ত ছিলেন। ভক্তরা সাধারণত আবেগপ্রবণ ও অত্যুৎসাহী হইয়া থাকে। পিতামহাশয়ের চরিত্রে এই দুটি গুণ যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে না ছিল এমন নহে। তবে, বোধ করি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতন মহাপুরুষের প্রতি পিতার আকর্ষণের বিশেষ কারণটি বিদ্যাসাগর-চরিত্রের পৌরুষ-রূপ। পিতাঠাকুর একদা পার্শ্ববর্তী কোনো গ্রামে বিধবাবিবাহ দিতে গিয়া থানা-পুলিস করিয়াছিলেন। পরে বিদ্যাসাগরের নামে গ্রামে একটা পাঠশালা খুলিয়া দিয়াছিলেন, সেখানে গ্রামের বালক-বালিকারা নির্ব্বিবাদে সকালে মুড়ি ছোলা চিবাইত এবং বিনিখরচায় পাওয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের পাতা ছিঁড়িত। কয়েকটি বাউরী ও ওইরূপ শ্রেণীর শিশুকেও পিতার বিদ্যাসাগর পাঠশালায় উলঙ্গ অবস্থায় মুড়ি চিবাইতে আমি দেখিয়াছি। সেই বিদ্যালয় আর নাই।

পিতামহ আমাদের অবস্থা সচ্ছল করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। পিতামহাশয় সচ্ছলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন। জমি-জায়গা, ধান, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি পূর্বেই হইয়াছিল; পরে পিতাঠাকুর কয়লাকুঠিতে কনট্রাক্টারির কাজ লইলেন, লরী খাটাইতেন,

মধ্যে মধ্যে পুরানো লোহালক্কড় নীলামে ডাকিয়া বেচিয়া দিতেন। একবার একটা ভাঙা বয়লার কিনিয়া গ্রামে আনিয়া তিনি আধুনিক চুল্লিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইট তৈরির চেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয় সেই ভাঙা বয়লারের পিছনে অর্থব্যয় হইল, ইট হইল না। পড়িয়া থাকিতে থাকিতে ফণিমনসার জঙ্গলে বয়লার ঢাকা পড়িল, গোখ্‌রো সাপের উৎপাত বাড়িল। ভাঙা বয়লারটাকে নরীযোগে অন্যত্র না পাঠাইয়া উপায় রহিল না।

প্রায় প্রবীণ বয়সে পিতামহাশয়ের মাথায় দুইটি খেয়াল চাপিল। কেমন করিয়া জানি না, তাঁহার ধারণা হইল, কৈশোর-বিবাহ আমাদের সমাজ ও সংসারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলকর। এই বিষয়ে তিনি পঞ্চান্নপৃষ্ঠাব্যাপী এক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ (নিজ অর্থে) করিয়া বিলাইতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় খেয়াল, নব্য আর্যসমাজ গোছের একটা প্রতিষ্ঠান খোলা। দ্বিতীয় খেয়ালটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, একমাত্র ফল ফলিয়াছিল এই যে, সেই সমাজের অনুশাসনে আমরা সামাজিক মেলা-মেশায় প্রায়শই সাধুভাষা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতাম, কারণ উহাই নাকি শিষ্টাচার-সম্মত ভাষা।

পিতামহাশয়ের প্রথম খেয়ালটি আমাদের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে। 'কথায় বলিব, কাজে করিব না'—পিতামহাশয় সেই ধাতের মানুষ ছিলেন না। কৈশোর-বিবাহ যে কত

উপকারী এবং মঙ্গলকর তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইবার জন্য তিনি আমার এবং চন্দ্রার বিবাহ দিলেন; একই মাসে—কয়েকদিন আগু-পিছুতে। আমি তখন চার মাইল দূরের লোহা-কারখানার হাইস্কুলে সেকেন্ড ক্লাসে পড়ি, বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর; চন্দ্রার চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার গোঁফ সবে উঠিতেছে, চন্দ্রা সদ্য শাড়িতে অভ্যস্ত হইয়াছে, এবং তাহার মাথায় বড়জোর হাত খানেক চুল হওয়ায় খোঁপার রকমফের করিতেছে। আমার মাথায় অবশ্য চুল না থাকার কথা, কিন্তু মাতা-পিতা বর্তমানে মুণ্ডিত-মস্তক হইব মাতা-ঠাকুরানীর তাহাতে ঘোরতর আপত্তি, ফলে আমার মস্তকে যাত্রাদলের দীন ব্রাহ্মণের পরচুলার মতন খোঁচা খোঁচা কিছু কেশ ছিল: তাহাকে কেশ না বলিয়া ক্লেশ বলাই সংগত। চন্দ্রাকে বেনারসী শাড়িতে কলাবউয়ের মতন মুড়িয়া বিবাহ-অনুষ্ঠানে বসানো হইয়াছিল। আমাকে ক্ষত্রিয় রাজপুতের অনুকরণে জরির কাজ করা মখমলের পিরান ও কোর্তা পরিয়া পাগড়ি বাঁধিয়া বিবাহযাত্রায় যাইতে হইয়াছিল। পিতামহাশয়ের হস্তে একটি কোষবদ্ধ অসি ছিল, পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন।

যাহা হউক, এই বিবাহের পরবর্তী অধ্যায়ই আমার কাহিনী। যেটুকু পিতৃপরিচয় দিলাম তাহা না দিলে গল্পের ভূমিকা জমিত না।

২

আমার বালিকা বধূটির নাম ছিল রজনী। ডাক নাম 'চিনি'। পিতৃগৃহে তাহার ডাক-নামের চলটাই বেশী ছিল; এমন কি আমাদের বিবাহের সময় কন্যাপক্ষ যে রুমাল-পদ্য ছাপাইয়াছিল তাহাতে নলিনীদিদি তাঁহার আশীর্বাদে রজনীকে 'চিনিপাতা দই' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'দই'-টি যে চিনিপাতা তাহাতে সন্দেহ কি, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পাইতে আমাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

বিবাহের সময় বয়স চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। বলা প্রয়োজন, আমার পিতা-মহাশয় বাল্যবিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, ফলে ত্রয়োদশ বৎসর পর্যন্ত এই কার্য হওয়ার উপায় ছিল না। তাঁহার সিদ্ধান্তে বাল্যকালটাকে বড়জোর ত্রয়োদশ বৎসর পর্যন্ত টানা যায়, তাহার পর কৈশোর। নিজ কন্যার ক্ষেত্রেও পিতাঠাকুর নিয়মটি রক্ষা করিয়া-ছিলেন।

সমবয়স্কা হওয়ার ফলে চন্দ্রা ও রজনীর মধ্যে স্বাভাবিক আত্মীয়তা গভীর সখিত্বে ও প্রণয়ে দাঁড়াইয়াছিল। কন্যা এবং পুত্রবধূ নিকটে থাকিলে আমার পিতা, প্রবল প্রতাপান্বিত সিংহমহাশয়ও গর্জন ভুলিয়া যাইতেন, মাতাঠাকুরাণীর মুখ হাসিভরা থাকিত এবং নাবালক ভ্রাতাটি তাহার 'পেণ্টবুল'

সম্পর্কে সতর্ক থাকিত। তবে কিনা, ননদ-ভাজে একত্রে বড় একটা থাকিতে পারিত না। বৎসরে দুই চারিবার তাহাদের একত্রে থাকার সুযোগ জুটিত, পালা-পার্বণে রজনীকে যখন শ্বশুরালয়ে আনানো হইত এবং চন্দ্রাকে পিত্রালয়ে।

চন্দ্রার স্বামীর নাম শরৎ। সে শহুরে ছেলে। আমার অপেক্ষা বয়সে সামান্য বড়। শরৎ-ভ্রাতা শরৎ ঋতুর মতনই সহাস্যপ্রকৃতির ছিল। তাহার গড়নটি ছিপছিপে, রঙ বেশ ফরসা; চক্ষু দুটিতে বুদ্ধি ও চতুরতার ছাপ ছিল। শরৎ শহরের স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়িত, অঙ্কে তাহার মাথা খুব সাফ ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বাঁকুড়া ক্রশ্চান কলেজে রাখিয়া তাহাকে সাইন্স পড়ানো হইবে, গুরুজনদের এইরূপ অভিলাষ ছিল।

শরৎ নানাগুণে ভাগ্যবান। তাহার পিতা পেশকারী করিতেন, সে শহরে থাকে, শহুরে স্কুলে পড়ে, দশ আনা ছয় আনা চুল ছাঁটে, সুদৃশ্য জামা জুতা পরে, বায়োস্কোপ দেখে; স্বভাবতই আমার কিঞ্চিৎ ঈর্ষা থাকার কথা। হয়ত তাহা ছিল, কিন্তু সর্বাধিক ঈর্ষা ছিল অন্য কারণে। চন্দ্রাকে বৎসরের মধ্যে নয় মাসই শরৎ কাছে পাইত, আমি রজনীকে তিন মাসও পাইতাম না। ভাগ্যবান শরৎ অবশ্য আমার বন্ধু হইয়া গিয়াছিল এবং সেই বন্ধুত্ব পরে আমার যথেষ্ট কাজে লাগিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িবার

সময় আমার বিবাহ হয়, আমার বয়স তখন ষোলো। বিবাহ হইয়াছিল ফাল্গুনে মাসে—চন্দ্রার বিবাহের পক্ষকাল পরেই। আমাদের কালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য যাহা পাঠ্য ছিল তাহার মধ্যে বিবাহসংক্রান্ত জ্ঞান-লাভের উপাদান কিছু ছিল না। 'জন গিলপিন', 'হ্যামেলিনের বাঁশীঅলা' প্রভৃতি মজাদার ইংরাজী কবিতা হইতে বা শেলী ওআর্ডস-ওয়ার্থ কীটস-এর জলস্থল আকাশ মেঘ পাখি ইত্যাদির টুকরা কবিতা হইতে বিবাহজ্ঞান জন্মায় না। ইংরাজী গদ্যের বেশীটাই ছিল রসকষহীন। অবশ্য টড্‌সাহেবের রাজপুত কাহিনীটা আমাদের বেশ পছন্দ ছিল। কিন্তু সেকেন্ড ক্লাসে উঠিয়াই তো এত সব আমার পড়ার কথা নয়, সুতরাং দুটি চারিটি বাঙ্গালা কবিতা ও গল্পগ্রন্থই আমাদের রসজ্ঞানের সম্বল ছিল।

মনে পড়িতেছে, আমার বিবাহের দিনটিতে অতি প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়াছিলাম। খুব দ্রুত আকাশ সাদা হইয়া গিয়াছিল। ফাঁকা মাঠ ও তৃণাচ্ছাদিত ঘাসে ফাল্গুনের শিশির পড়িয়া গ্রাম্য পথপ্রান্তর বড় কোমল দেখাইতেছিল। আম জাম শিশুগাছের আশ্রয় ছাড়িয়া পাখি-গুলি উড়িয়া যাইবার পূর্বে অনেকক্ষণ ডাকা-ডাকি করিয়াছিল। সূর্যোদয়ের সময় আমার স্নানপর্ব চলিতেছিল এবং তখন একটি ভোরের কোকিলও কুয়াতলার পাশে নিমগাছে বসিয়া মধুর করিয়া ডাকিতেছিল।

সন্ধ্যায় বিবাহ। আমাদের ভাড়া-খাটা লরীতে শতরঞ্জি চাদর বিছাইয়া বরযাত্রীরা চলিল। একটি ভাড়াটে বাস আনানো হইয়াছিল, তাহার মধ্যে পিতামহাশয়ের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন, ড্রাইভারের পিছনে গদিআঁটা ফার্স্ট ক্লাসে বরবেশী আমি ও আমার পাশে শরৎ। পিতাঠাকুর পিছনে ছিলেন। পথে ফাল্গুন মাসের বৈকালিক হাওয়া দাপাদাপি শুরু করিল। এ-সময় আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছিলাম। শরৎ আমার গায়ে হেলিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, 'ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক, রজনী সমাগমে না থাকিবে দুখ...।' শরৎটা যে একটু-আধটু কাব্যচর্চা করিত তাহা আমি তখন অবগত ছিলাম না।

মাসটি ফাল্গুন, শুক্ল পক্ষ, লগ্ন ছিল সন্ধ্যায়। যথারীতি অগ্নিসাক্ষী, শুভদৃষ্টি, হোম ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আমার বিবাহকর্ম সম্পন্ন হইল। বলিতে কি, আমি এই বিবাহের এক আনা বুঝিলাম, পনেরো আনা বুঝিলাম না। চন্দ্রার বিবাহে যাহা যাহা ঘটিতে দেখিয়াছি প্রায় সেই রকমই সব ঘটিতে লাগিল। যে যাহা করিতে বলিল অত্যন্ত ভক্তিভরে তাহা পালন করিলাম। ইতিপূর্বে দু একবার আমার সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল, জ্বর আসিলে আমার চোখ লাল হইত, গায়ের লোমগুলি ফুলিয়া সজারুর মতন হইত। বিবাহকালে অবস্থাটা প্রায় সেই

প্রকার হইয়াছিল। শুভদৃষ্টির সময় চারিপাশে প্রচণ্ড কলরবের মধ্যে লাল লাল চোখ লইয়া একবার তাকাইয়াছিলাম, কি দেখিয়াছিলাম কে জানে, ক্ষণেকের জন্য স্কুলের সরস্বতী ঠাকুরের কথা মনে পড়িয়াছিল এবং আমি হাতের মালাটি বধূরে গলায় পরাইয়া দিবার সময় পুষ্পাঞ্জলি দিবার মতন কত না বিনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছি। পারিয়াছি কি না জানি না। পালটা মালা দিবার সময় রজনী যে কি করিয়াছিল আমি দেখি নাই, মুদিত নয়নে ছিলাম। কিন্তু আমার দৃঢ় সন্দেহ মালাটি কোনো রকমে আমার মাথায় গলাইয়া দিবার সময় সে আমার কানে হাত দিয়াছিল। রজনী অবশ্য তাহা স্বীকার করে না।

রজনীকে মোটামুটি ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম বাসরঘরে। মস্ত বাসর বসিয়াছিল. বিস্তর মেয়েপুরুষ, তাকিয়া বালিশ, গোলাপ জলের ছিটা, ফুল হারমোনিয়াম। নানা বয়সের নানা আকারের মেয়েদের কলকোলাহলে আমার জ্বর ছুটিয়া ঘাম ছাড়িল। শরৎ-টরৎও বাসরে ঢুকিয়াছিল। সে আমায় ভরসা দিল, দুই চারিটা মেয়েলী প্রশ্নের চমৎকার জবাবও দিয়াছিল। এই হট্টগোল রাতে কমিয়া আসিল। আমাদের বরযাত্রীরা বিদায় লইল।

সামান্য বেশী রাত্রে নলিনীদিদি বাসরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার গান হইল, হাসি-তামাশা হইল। নলিনীদিদির সেই গানটির কথা আজও আমার কিছু কিছু মনে পড়ে:

'আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে নিয়ে এই হাসি রূপ গান...।' গাহিতে গাহিতে তিনি যখন আমার প্রতি কৌতুককটাক্ষ করিয়া গাহিতেছিলেন: 'আজি, হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা, তোমাতে হউক অবসান—' তখন আমার সদ্যোবিবাহিত বালিকা বধূটির হৃদয়ের আশা, সুখ, ভালবাসা ইত্যাদি বিষয়ে বিন্দুমাত্র কিছু অনুমান করা আমার অসাধ্য ছিল।...যাহা হউক, গানের পর রঙ্গ-তামাশা শুরু হইল। শেষে নলিনীদিদি আমায় বলিলেন "ভাই, এবার বলো তো আমাদের চিনি কেমন মিষ্টি?"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। লজ্জায় মুখমণ্ডল তপ্ত হইতে লাগিল। নলিনীদিদি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, চিনি তাহার সমবয়সীদের সহিত গুজগুজ করিতেছিল, হাসিতেছিল, লুডো খেলিতেছিল। আমি কি বলিব বুঝিতে না পাইয়া বলিলাম, "জানি না।"

তখন নলিনীদিদি হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিলেন, বয়স্কাদের উঠিতে বলিলেন, এবং চলিয়া যাওয়ার সময় আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিয়া গেলেন, "একটু চেয়ে-চেখে দেখ, মিছরি না মধু! ওমা, তুমি কেমন ছেলে গো?"

বড়রা গেল, ছোটরা থাকিল। ছোট অর্থে রজনীর সমবয়সী আত্মীয় মেয়েরা, এবং কিছু ঘুমন্ত বাচ্চাকাচ্চা। দুইজন যুবতী বধূও

থাকিলেন, দেখাশোনার জন্য। বলিতে কি, এই সময় সাহস করিয়া আমার বধূটিকে নিরীক্ষণ করিলাম।

আমার মাতাঠাকুরানীর নানা অলংকার আমি দেখিয়াছি। তাঁহার গহনার মধ্যে একটা প্রজাপতি ছিল, মিনার কাজে ভরা। রজনীকে যেন সেই রকম দেখাইতেছিল। শাড়িতে, জামায়, গহনায় তাহার সর্বাঙ্গ ঢাকা, নানা ধরনের রঙ ও উজ্জ্বলতা মিনাকরা কাজের মতন তাহার ক্ষুদ্র অবয়বটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তাহার মুখমণ্ডল মোটামুটি এতক্ষণে ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল। লম্বা, চিকন গড়নের মুখ, চিবুকটি যেন বরফিকাটা, নাকটি বাঁশির মতন, কপাল ছোট, পাতাকাটা। খোঁপার জন্য কপালের অনেকখানি এবং কান ঢাকা পড়িয়াছে। রজনীর চক্ষু দুটি অবিকল কাজললতা। টানাটানা চোখের তলায় তাহার চঞ্চল কৌতুকভরা মণি দুইটিও আমি লক্ষ করিলাম। রজনীকে আমার চোখে ধরিয়াছিল; রঙটি সামান্য চাপা না হইলে বুঝি আরও ভাল লাগিত।

বাচ্চাকাচ্চারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, রজনীর সখীরা আমার সহিত ছড়া কাটা, ধাঁধা ইত্যাদির খেলা খেলিতে খেলিতে ঢুলিতে লাগিল। ধাঁধায় আমি নিতান্ত অজ্ঞতা প্রদর্শন করিলাম। রজনী আমার শত্রুতা করিয়া তাহার সখীদের উদ্ভট উদ্ভট ছড়ার ধাঁধা স্মরণ করাইতে লাগিল। এইরূপ শত্রুতায় সে যথেষ্ট আনন্দ

পাইতেছিল। অবশেষে তাহার সখীরা একে একে ঘুমাইয়া পড়িল, যুবতী বধূ দুটি নিদ্রিত হইলেন। রজনীও কখন মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া পা-বুক দুমড়াইয়া শিশুর মতন ঘুমাইয়া পড়িল।

আমার হাই উঠিতেছিল। জানালার বাহিরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্না যেন আমার মুখের সামনে অবিরল হাসিতেছিল। হাসি দেখিতে দেখিতে আমিও কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৩

পুত্রের বিবাহে পিতামহাশয় ধুমধাম কিছু মন্দ করেন নাই। সানাই বাজিয়াছিল, ভিয়েন বসিয়াছিল; সকল ব্যবস্থাই চন্দ্রার বিবাহের অনুরূপ। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছাড়াও পিতাঠাকুর আমার স্কুলের মাস্টার-মহাশয়দের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মাস্টার-মহাশয়রা আমার বিবাহে কিছুটা কৌতুক অনুভব করিলেও তেমন বিস্মিত হন নাই। এইরূপ বিবাহ ওই অঞ্চলে তখনকার দিনে অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য ছিল না। আমার সহপাঠী বন্ধু কয়েকজন আসিয়াছিল, তাহারা আমার কানে কানে এমন সব প্রশ্ন শুধাইতে লাগিল যাহার জবাব আমার জানা ছিল না। তাহারা হাসাহাসি করিল আমায় কিলচড় মারিল। অন্তরালে শরৎ আমার গলা জড়াইয়া দুই একটি

বিশেষ পরামর্শ দিল।

ফুলশয্যার ঘরে রজনীকে নূতন করিয়া দেখিলাম। চন্দ্রা ভ্রাতৃজায়ার হাত ধরিয়া ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। দুই দিনেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যে বেশ জমিয়া গিয়াছে তাহার সংবাদ আমার জানা ছিল। বিবাহিতা বলিয়া এই কয়দিনেই যেন চন্দ্রার একটা সাবালিকার মর্যাদা-বোধ জাগিয়াছে, বিশেষত ভ্রাতার বিবাহে তাহার পদমর্যাদা ও নবলব্ধ গৌরবটি সে বিলক্ষণ প্রকাশ করিতেছিল।

উহারা যখন আসিল তখনই বেশ বোঝা গেল, দুইজনার মধ্যে পূর্ব্বে হইতেই কেমন একটা হাস্যকৌতুক রঙ্গ চলিতেছিল, আপাতত তাহার প্রকাশ্য লক্ষণ না থাকিলেও পরোক্ষ চিহ্নগুলি বর্তমান ছিল। উভয়কেই যথেষ্ট সাবালিকা করার চেষ্টা সাজসজ্জায় ছিল, কিন্তু শরীরে অথবা আচরণে ছিল বলিয়া মনে হয় না। বালিকাত্ব না ঘুচিলেও উভয়কে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। (অকালের ফল শুনিয়াছি বরাবরই অধিকতর সুস্বাদু এবং মিষ্ট।) চন্দ্রা অনুচ্চ গলায় কি যেন দুই চারিটা কথা বলিল, পাথরের গেলাস টেবিলে রাখা পান জল দেখাইয়া দিল, তাহার পর সহাস্য মুখে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বাহির হইতে দ্বার বন্ধের শব্দ শুনিলাম।

বসন্তকাল হইলেও ফুলশয্যার জন্য তেমন একটা ফুলের বাহুল্য শয্যায় ছিল না। বাড়ির

বাগানের কিছু ফুল ও বেলকুঁড়ি, দুইটি বেলফুলের মালাও ছিল। মৃদু মৃদু ফুল-গন্ধ শয্যায়। ষোড়শ-বৎসরের বিবাহিত কিশোরটি তাহার নবপরিণীতা বালিকা বধূকে দেখিতেছিল, কখনও সলজ্জ মুখে, কখনও বুঝি সাহসভরে।

রজনীকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। পরনে লাল-খয়েরী ডুরে শাড়ি, গায়ের জামাটা সামান্য বড় বড়, মাথায় আধখানা ঘোমটা, হাতভরা অলংকার। মানুষটির তুলনায় সবই বড় বড় তথাপি ওই বালিকাটির বধূরূপে কোনো ঘাটতি ছিল না।

চন্দ্রা চলিয়া যাওয়ার পর রজনী অল্পক্ষণ দরজার দিকে দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। আমি ঘরে আছি কি নাই সে-বিষয়ে তাহার মনোযোগ দেখা গেল না। আমার বুকটাও এ-সময়ে বড়ই ধড়ফড় শুরু করিয়া হৃদপিণ্ডটা যেন অনবরত লাফ মারিতেছিল।

রজনী আগাইয়া গিয়া সশব্দে দরজার খিল বন্ধ করিল। আমার কান দুইটি তৎক্ষণে আগুন হইয়াছে চোখ করকর করিতেছিল।... রজনীর ভাবগতিক ভিন্ন প্রকৃতির। সে দরজায় গা হেলাইয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মুখে সকৌতুক উত্তেজনা ও হাসি।

ঘরে একটা চীনা টেবিল-বাতি জ্বলিতেছিল। ঘরটি দোতলার। পূর্ব-দক্ষিণের জানালাগুলি খোলা, বাহিরে আমগাছের পত্রপল্লবে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে, বাতাসে পাতার

শব্দ ভাসিতেছে।

সামান্য সময়ই যেন কত দীর্ঘ মনে হইল। দেখিলাম, রজনী নিঃশব্দে খিল খোলার চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না। এ ঘরের খিলটা বেশ আঁট ও শক্ত, গায়ের জোর বা দমকা ধাক্কা বিনা তাহাকে আয়ত্তে আনা যায় না। রজনী সামান্য চেষ্টা করিয়া তাহার চোখের ইশারায় আমায় ডাকিল। পা পা করিয়া নিকটে গেলাম। রজনী কথা বলিল না, হাত মুখের ইশারায় আমায় বুঝাইয়া দিল, সাবধানে নিঃশব্দে আমায় খিলটি খুলিয়া দিতে হইবে। কিছু একটা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, রজনী তাহার ওষ্ঠে আঙুল তুলিয়া আমায় নীরব থাকিতে বলিল

রজনীর পরামর্শ মতন খিল খোলা হইল। চোখের ইশারায় সে আমায় পাশে সরিয়া যাইতে বলিল। আদেশ পালন করিলাম। রজনী আচমকা দরজাটা খুলিয়া ধরিতেই মূর্তিমান শরৎকে দেখা গেল, চন্দ্রা ছুটিয়া পালাইতেছিল, সশব্দে বারান্দায় আছাড় খাইল।

হাসির খিলখিল, হোহো শব্দ; আরও যেন কাহারা কোথাও লুকাইয়াছিল, তাহারা অন্তর্ধান করিল।

ধরা পড়িয়া চোরের মতন শরৎ বলিল, "আমি কিছু জানি না; ওরা আমায় এখানে দাঁড়াতে বলল।"

রজনী জিব ভেঙচাইয়া বলিল, "আহা, গঙ্গাজল... !"

মতিঠাকুমা আসিয়া শরৎকে ডাকিলেন, "এই জামাই, শুতে যা! রাত কত হচ্ছে জানিস—!"

শরৎ সুবোধ বালকের মতন চলিয়া গেল।

ঘরের দরজাটা এবার আমিই বন্ধ করিলাম। রজনী তখনও যেন হাসির ঘোরে ছিল। চোর-ধরা খেলায় তাহারে প্রচুর কৌতুক জুটিয়াছে।

কিঞ্চিৎ সাহস আসায় আমার তৃষ্ণা পাইয়াছিল। আমি জল খাইলাম। রজনী তাহার মাথার ঘোমটাটা পুরাপুরি খুলিয়া ফেলিল। তাহার চুল যথেষ্ট, তবু অত বড় খোঁপা হওয়ার কথা নয়, কোনো রকম একটা কারিকুরি করিয়া বেশ বড় একটা খোঁপা রচনা করা হইয়াছে, তাহাতে সোনার চিরুনি, রুপার কাঁটা। রজনীর কাঁধটি পরিষ্কার; মটরমালা-হারের আঙটাটা সেখানে চিকচিক করিতেছে।

পাথরের টেবিলের নিকট সরিয়া গিয়া রজনীও ঢকঢক করিয়া এক গ্লাস জল খাইল, তাহার পর পানের ডিবা হইতে দুইটি পান লইয়া মুখে ভরিয়া চিবাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পানের রসে তাহার ওষ্ঠ রাঙা হইল। রজনীর মুখের তুলনায় পানের খিলি দুটো যে বেশ বড় তাহাতে সন্দেহ কি! গাল ভরতি পানের পিচ তাহার পাতলা পাতলা ঠোঁট উপচাইয়া থুতনিতে পড়িল; আমি মুগ্ধনেত্রে আমার বালিকা বধূর চিবুকে সেই লাল ফোঁটাগুলি দেখিতেছিলাম।

বিছানায় বসিয়া রজনী গায়ের আঁচলটা আলগা করিল; পারিলে যেন এ বোঝা মুক্ত

করিয়া সে হালকা হইত। খাটের কিনারায় পা ঝুলাইয়া তাহা দোলাইতে দোলাইতে রজনী একবার আমার দিকে তাকায়, পরক্ষণে মুখ ফিরাইয়া লয়। তাহার পায়ে রুপার বিছা-মল, সে যতই পা দোলায় ততই মলের ছোট ছোট দানাগুলিতে ঝিনঝিন করিয়া শব্দ ওঠে।

বার কয়েক আমার দিকে তাকাইবার পর রজনী ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহাকে হাসিতে দেখিয়া আমিও হাসিলাম। যেন হাসি এবং পালটা হাসির মধ্য দিয়া গোড়ার আলাপটা সারা হইয়া গেল।

বাহিরে প্রবল বাতাসের একটা দমকা আসিয়াছিল। খোলা জানালার পাটগুলিতে শব্দ হইল, একটা পাট সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল; বাহিরের আমগাছটার ডালপালায় মড় মড় সর সর শব্দ উঠিল।

রজনী জানালার দিকে তাকাইয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। "কি শব্দ—?"

"গাছের।"

"কি গাছ?"

"আম।"

"কাঁচামিঠে?"

"কাঁচায় কাঁচা, পেকে গেলেই পাকা।"

রজনী তেমন প্রসন্ন হইল না, মুখে একটা সন্দেহের ভাব ফুটাইয়া বলিল, "তোমায় বলেছে—!"

অল্প চুপচাপ। বাতাসে বন্ধ জানালার পাটটি আমি খুলিয়া দিতে গেলাম। বাহিরে উথাল-

পাতাল বাতাস, টলটলে জ্যোৎস্না। আমগাছটি হেলিয়া দুলিয়া চাঁদের কিরণে পাতা ভিজাইয়া যেন আপন মনে মাথা নাচাইতেছে।

আমি ফিরিয়া আসিতেই রজনীর যেন হঠাৎ কি মনে পড়িল। সে তাহার পাতলা লাল-টুকটুকে জিবটি আধ বিঘত বাহির করিয়া 'অ্যা—ই' বলিয়া জিব কাটিল। পরক্ষণেই দেখি বিছানা হইতে তড়াক করিয়া নীচে নামিল। আমি থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছি। রজনী পায়ের মল বাজাইয়া আমার মুখোমুখি আসিল, তাহার পর পলকে আমার পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম সারিল। আমি নির্বোধের মতন দাঁড়াইয়া থাকিলাম। রজনী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মা বলে দিয়েছিল বরকে পেন্নাম করিস, দিদিও বলেছিল। আমি ভুলেই গিয়াছিলাম।"

'বর' শব্দটি আমার কানে বড়ই মিঠা হইয়া বাজিল, বাজিয়া মরমে প্রবেশ করিতেছিল। বোধ করি সেই আবেশে আমি চক্ষু দুইটি বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু রজনী হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি চক্ষু চাহিয়া দেখি, সে মুখে আঁচল চাপা দিতেছে। হাসি পাওয়ার মতন উপাদান কোথায় ছিল জানি না, তবে মনে হইল আমার মুদিত চক্ষু ও মৌখিক আবেশটা বোধ করি রজনীকে হাসাইয়াছে। ক্ষুণ্ণ হইলাম।

রজনী আঙুল দিয়া শেষে হাসির উপাদানটা

দেখাইল। দেখিলাম আমার ধুতির কোচায় খানিকটা সিন্দুর লাগিয়াছে। প্রণাম করার সময়ে হোক অথবা উঠিবার সময়ে হোক রজনীর সিঁথির সিঁদুরে আমার এই অবস্থা। হাত দিয়া পরিষ্কার করিতে গেলাম, হাত লাল হইল, ধুতিটা আরও লাল হইয়া গেল। রজনী আরও মজা পাইয়া হাসিল। হয়ত একটু লজ্জিত হইয়াছিলাম, কিন্তু কি যেন অদৃশ্য কারণে রোমাঞ্চিত না হইয়াও পারিলাম না।

হাসি থামিলে রজনী বিছানার কাছে গেল। খেলাচ্ছলে কয়েকটা ফুল তুলিয়া লইয়া লোফালুফি খেলা খেলিল, তেঁতুলবীচি লইয়া মেয়েরা যেমন খেলে; তাহার পর খোঁপায় ফুল গুঁজিবার চেষ্টা করিল।

জানালার বাহিরে একটা ঘুমভাঙা কাক ডাকিল। মস্ত একটা হাই তুলিয়া রজনী বলিল, "কাক ডাকছে। রাতে কাক ডাকা খারাপ।" বলিয়া বিড়বিড় করিয়া কোনো একটা মন্ত্র পড়িয়া সে এই অশুভকে কাটাইল।

আমি বলিলাম, "খুব জ্যোৎস্না ফুটলে কাকরা ডাকে; ভাবে ভোর হচ্ছে।"

রজনীর জ্যোৎস্না দেখিবার সাধ হইল, কিন্তু জানালার দিকে যাইবার সাহস হইল না। বড় বড় খোলা জানালা, বাহিরে আসিগাছে বাতাসের সরসর শব্দ, চারিপাশ নিস্তব্ধ ও নিদ্রিত হইয়া আসিয়াছে। সাহসাভাবে রজনী কয়েকবারই জানালার দিকে তাকাইল, পা বাড়াইল না।

বধূর মনোভাব বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না, আমি জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। প্রায় সাথে সাথেই রজনী আমার পাশে আসিল।

আমাদের বাড়ির পাঁচিল তোলা সীমানাটা পার হইলেই তেঁতুলতলা, ছোট ছোট ঝোপ, পথ, মাঠ, উঁচু নীচু প্রান্তর, অনেকটা দূরে রেল লাইন।

ফাল্গুনের অফুরন্ত দক্ষিণা বাতাসে এবং মরি-মরি চাঁদের আলোয় আমার বালিকা বধূটির উচ্ছ্বাস জাগিল। বলিল, "কী চমচমে জোছনা—!"

হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, "চমচমে জোছনা আবার কি!"

রজনী অবাক। ওমা, মানুষটা চমচমে জ্যোৎস্না বোঝে না! কাজললতার মতন চক্ষু দুটির পল্লব বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল, "চমচমে জানো না?"

"চমচম জানি। খায়।"

আমার অজ্ঞতা এতই নিদারুণ যে বিষয়টি সম্পর্কে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার আগ্রহ আর রজনীর হইল না। বেজার হওয়ার মতন মুখভঙ্গী করিয়া রজনী বলিল, "পেটুক ঠাকুর।...খালি মেঠাই চেনেন...!"

"আমি মিষ্টিমণ্ডা খাই না।"

"ই...রে; খায় না আমার।...গপাগপ খেতে দেখলাম।"

"কোথায়?"

"আমাদের বাড়িতে, তোমাদের বাড়িতে।"

"সে বিয়ে বলে। খেতে বলল সবাই।"

রজনী মাথা দুলাইয়া আমার শেষ কথাটা পুনরাবৃত্তি করিল, অবশ্য রঙ্গভরে।

তাহার পর দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "নাড়ুগোপাল রে! খেতে বললে খায়, না বললে আঁচায়।" কথাশেষে ওষ্ঠের প্রান্তে এমন একটি পরিহাসের কুঞ্চন তুলিল যে আমি অপলকে তাহা দেখিতে লাগিলাম।

কি মনে পড়ায় রজনী বলিল, "তুমি কানমলা খেয়েছ?"

"কি—?"

"কানমলা—!"

"ভাগ্!"

"বেণুদিদি তোমায় খাওয়ায় নি! আমার সামনে বসে খেয়েছ।"

"অত সস্তা!..."

"ওমা, এ কেমন রে।" রজনী চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া গালে হাত তুলিল, বলিল, "বাসী বিয়ের দিন সকালে আমার সামনে বসে কি খেলে?"

ঘটনাটি মনে পড়িল। রজনীর কোন আত্মীয়া আমার কর্ণে অতি গোপনে কয়েকটি কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, স্বভাবতই তিনি কয়েকবার আমার কানে হাত ও মুখ দিয়াছেন এবং বস্তুতই কিছু বলেন নাই।...বুঝিলাম সেই গোপন কথার ব্যাপারটা হয়ত একটা ষড়যন্ত্র ছিল।...বিষয়টা গ্রাহ্য না

করিয়া রজনীকেই উল্টা চাপ দিলাম, "তুমিই আমার কানে হাত দিয়েছ।"

"যাঃ।"

"দিয়েছ। মালা দেবার সময়।"

"এ মা! কী মিথ্যুক! ছি ছি—" রজনী যেন লজ্জায় মরিয়া গিয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল, "আমি বলে হাত পাই না! অত্ত বড় মাথা...! এখন আমার নামে দোষ।..."

রজনীর ভয়ভক্তি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

দুই পাঁচটি অর্থহীন অন্যান্য কথার পর রজনী শুধাইল, "তোমার ইস্কুল কতটা পথ?"

"চার মাইল।"

"হেঁটে যাও?"

"হাঁটব কেন সাইকেল আছে।"

"তুমি সেকেন্‌ড্‌ কেলাসে পড়?"

"আসছে বছর ফার্স্ট, তারপরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব।"

"ক'বারে পাস?"

"ক'বার!"

"মধুদা তিন বারের পর চার বারে পাস করেছিল।"

"হ্যাত্‌...। গাধারা তিনবারে পাস করে।"

"ই, মা...কী অসভ্য!"

রজনীর ভর্ৎসনার কারণ বুঝিলাম না।

রজনী বলিল, "গুরুজনকে গাধা বললে! সহবত জানো না!"

সত্য বটে। জিব কাটিলাম। বলিলাম, "মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আমার মুখ খুব ফসকা।

আমি কিন্তু একবারেই পাস করব।"

"উলটে মলটে করবে।" রজনী হাসিতে লাগিল।

রজনীর আবার হাই উঠিল, তাহার দেখাদেখি আমারও। হাই জিনিসটা বড় ছোঁয়াচে।

"তুমি গল্পটল্প জানো?" রজনী হাতের পিঠে চোখ রগড়াইল।

"গল্প!...কিসের গল্প!"

"কে জানে!...ভূতের গল্প আমি শুনব না। রাক্ষস-ফাক্কসের নয়।" বলিয়া রজনী আমার দিকে তাকাইল, তাহার সন্দেহ হইল, সে যা বলিতেছে আমি বুঝিতেছি না। নাক কুঁচকাইয়া রজনী বলিল, "ছেলেটা কি রে!...বিয়ে করে আবার—।"

আমরা বিছানায় ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। রজনী কয়েক মুহূর্ত পরেই চিত হইয়া বালিশে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল। শাড়ির স্তূপীকৃত আঁচলটা তাহাকে বড়ই বিব্রত করায় সে পুঁটলির মতন করিয়া খানিকটা আঁচল পাশে সরাইয়া রাখিল। সামান্য পরেই জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মাথা ধরেছে?"

"না; মাথা ধরবে কেন!"

"জিগ্‌গেস করতে হয়। দিদি বলেছিল, বরকে জিগ্‌গেস করবি মাথা ধরেছে কি না। যদি বলে হ্যাঁ, তবে আস্তে আস্তে মাথা টিপে দিবি।"

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, রজনী যেন অপ্রতিভ হইল।

"কেমন করে হাসে রে—" রজনী ঠোঁট উলটাইয়া বলিল।

"হাসির কথা শুনলে হাসব না!"

"ভূত!"

"কে, আমি?"

"আমার পাশে।" বলিতে বলিতে হঠাৎ যেন কি মনে পড়ায় রজনী আমার চোখে চোখে তাকাইল, "আচ্ছা, একটা ধাঁধা বলো তো দেখি;

চেহারাটি ঝরঝরে
বাবুমশায় ফরফরে
বাতাসেতে উড়ে যায়
জল পড়লে গলে যায়।"

ঝরঝরে চেহারার বাতাসে-ওড়া জলে-গলা বস্তুটি কি হইতে পারে আমি অনুমান করিতে চেষ্টা করিলাম। "বাবুমশায়" শব্দটা গোল পাকাইতেছিল। যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিলাম না। কতই যেন আকাশ-পাতাল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া হতাশ হইয়াছি, বলিলাম, "কি জানি!"

"ই রাম, এত্ত সোজা...জল একেবারে, তাও পারছ না!"

"না, তুমিই বলো।"

"তুমি কাঁচকলা পাস করবে।" আমার পাস ফেল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া রজনী নিশ্বাস ফেলিল, তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, একটু বলছি—ধরিয়ে দিচ্ছি জিনিসটা এই ঘরেই আছে" রজনী আভাসটুকু ধরাইয়া দিয়া
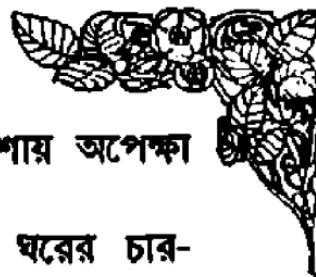
সকৌতূহলে আমার উত্তরের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিল।

"এই ঘরে আছে—?" আমি ঘরের চারপাশটা দেখিবার ভান করিলাম।

"তোমার কা—" বলিতে বলিতে রজনী কোনো রকমে মুখের কথাটায় লাগাম কষিল, যেন অল্পের জন্য সবটাই মাটি হইয়া যাইত।

আমি মাথা চুলকাইলাম। "কোথায়?"

"সব বলে দিই আর কি!"

"জানলায়?"

"না।"

"টেবিলে!"

"না।"

"তবে কোথায়?"

"চোখ থাকলেই দেখতে পাবে।" রজনী তাহার ওষ্ঠ দুটির ঝাঁপ বন্ধ করিয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া থাকিল।

রজনীর সরল সুন্দর মুখটির দিকে আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। তাহার কপালে চন্দনের কদম টিপ, শিশিরবিন্দুর মতন ছোট ছোট লবঙ্গটিপগুলির কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে; চোখে কাজল, থুতনির উপর পানের পিচের সেই অল্প লাল দাগ, গলায় ডালিম দানার মতন একটি তিল। মাথার সরু সিঁথিটা বড়ই শীর্ণ, কিন্তু প্রচুর সিঁদুরে মাঝ মাথা পর্যন্ত লাল। স্বীকার করিতে দোষ নাই, ভগ্নীপতি শরতের পরামর্শ ও শিক্ষা এ-সময় আমার কানে দুষ্ট মন্ত্র দিতে লাগিল।
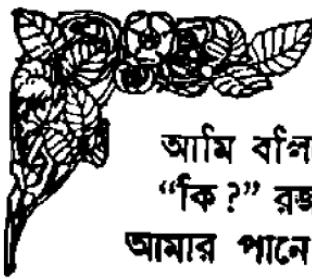
আমি বলিলাম, "দেখতে পেয়েছি।"

"কি?" রজনী কড়িকাঠ হইতে চোখ সরাইয়া আমার পানে তাকাইল।

"বলবো?"

"বলো।"

"চিনি।"

একটি পলক বুঝি রজনী নীরব। পর মুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখখানি সলজ্জ সকৌতুক হাসিতে পূর্ণ করিয়া জিবের ডগা বাহির করিয়া আমায় ভেঙচাইল, "ইস্ রে, চিনি। কি চিনি? দিশি না ফরসা চিনি?"

"আমার চিনি।"

শরৎ প্রদত্ত মুখচুম্বনের শিক্ষাটি অশিক্ষিতের মতন প্রয়োগ করিলাম। চিনি অথবা রজনী সেই মুহূর্তে যেন আর সাড়া শব্দ করিল না। তাহার পর সে লাজুক চাহনির মতন পলকে আমায় একটা প্রতিদান দিল। চমচমে জ্যোৎস্নার মতন আমার সর্ব ইন্দ্রিয়ে একটা চমচমে ভাব হইল। ততক্ষণে রজনী তাহার পুটলি করা আঁচলটা মুখের ওপর চাপাইয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

৪

ঘুম ভাঙিয়া গেল। নিদ্রার আবেশে প্রথমটায় বুঝিতে পারি নাই; পরমুহূর্তে বুঝিলাম নূতন শয্যায় নববধূর পাশে আমি শুইয়া আছি। রোমাঞ্চকর আনন্দ ও সাবালকত্বের

মর্যাদা অনুভব করিয়া চোখ মেলিলাম। ভোর হইয়াছে বটে, তবে এখনও সকালের ফরসা-টুকু তেমন পরিষ্কার নয়। বাহিরে একটি দুটি করিয়া কাক জাগিয়া উঠিয়া ডাক দিতে শুরু করিয়াছে। প্রত্যূষের শীতল বাতাসে শিহরণ উঠিতেছিল। মাথা ঘুরাইয়া রজনীকে খুঁজিতে গিয়া দেখি, বালিশটা ফাঁকা। রজনী কি উঠিয়া গেল? মাথা সামান্য উঁচু করিতেই চোখে পড়িল, ঘুমের ঘোরে আমার বালিকা বধূটি ঘড়ির কাঁটার মতন ঘুরিয়া গিয়াছে। মস্ত পালংক, তাহার কোনো অসুবিধা হয় নাই, ঘুরিতে ঘুরিতে সে মাথাটাকে আমার পায়ের দিকে কোনাকুনি করিয়া তাহার চরণ-যুগল আমার বুকের কাছে আনিয়া হাঁটু ভাঙিয়া দুমড়াইয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছে। সম্ভবত ভোর রাতে শীত শীত করায় গায়ের আঁচলটাকে চাদর করিয়া মাথামুখ মুড়ি দিয়াছে।

রজনীর আলতাপরা পা দুখানি যে কত ছোট এবং পায়ের পাতা কত পাতলা তাহা দেখিতেছিলাম, বাসী অথচ ফিকা গন্ধ নাকে লাগিল, মাথা আরও একটু নীচু করিতেই বুঝিলাম, গন্ধটা সুগন্ধি আলতার, শাড়ি ও বিছানায় ছড়ানো সেন্টের।

রজনীর পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দিয়া তাহার ঘুম ভাঙানোর লোভে আমায় পাইয়া বসিল। হাতের আঙুলের সুড়সুড়ি তেমন জুতের হইবে না ভাবিয়া আমি বিছানা হইতে

একটা বাসী ফুল তুলিয়া লইয়া রজনীর পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দিতে লাগিলাম।

ঘুমটা দেখি রজনীর বেশ গভীর। ফুলে কাজ না হওয়ায় হাতের আঙুলে বার কয়েক সুড়সুড়ি দিতেই রজনী পা টানিয়া লইল, আমার আনন্দ বাড়িল, পুনরায় সুড়সুড়ি দিতে লাগিলাম। রজনী পা গুটায়, শরীর গুটায়, পাশ ফেরে, শেষে তাহার লোমকূপ-গুলিতে রোমাঞ্চ জাগিতে সে ধড়ফড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসে। নিদ্রাভঙ্গের আকস্মিকতায় তাহার মুখভাবে খানিকটা বিমূঢ়তা, কিছুটা বিস্ময়, সামান্য বা বিরক্তি। আমি হাসিতেছিলাম। রজনী কয়েক মুহূর্ত পরে যেন হুঁশ ফিরিয়া পাইল। জানালা, ঘরের চারিপাশ, বিছানা এবং তাহার নবলব্ধ ষোড়শ-বর্ষীয় স্বামীটিকে দেখিয়া লইয়া যেন কোনো একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হইল। দুই হাতে চোখের পাতা রগড়াইয়া ঘুমের জড়তা কাটাইল, হাই তুলিল, এবং টুপ করিয়া দুই হাত জোড় করিয়া একবার ঠাকুর প্রণাম সারিল।

"আমার পায়ে তুমি সুড়সুড়ি দিচ্ছিলে!" ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া ওঠার পর রজনী এই প্রথম কথা বলিল।

"কই, না।"

"বাসীমুখে মিথ্যে কথা!" রজনী শিহরিয়া উঠিল।

"তুমি আমার মুখের দিকে পা করে ঘুমোচ্ছিলে কেন?"

প্রথমটায় যেন রজনীর বিশ্বাস হইল না, পরে বলিল, "সত্যি!" বলিয়াই নিজের অবস্থান ও বিছানার দশাটা দেখিয়া লইয়া বড়ই অপ্রতিভ হইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিল। "এ রা-ম, ছি ছি! আমার পায়ে কুট হবে। এই, তোমার গায়ে পা লেগেছিল?"

"না—না।" আমি হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িলাম। আমার বালিকা বধূটি ঘুমের ঘোরে যে তাহার চরণ দুইটি আমার অঙ্গে ছোঁয়ায় নাই এমন কথা আমি বলিতে পারি না, তথাপি উদারতাবশে অস্বীকার করিলাম।

রজনী বলিল, "আমার শোওয়া বড় খারাপ। মা, পিসিমা, দিদি সবাই বকে। কত করে বলে দিয়েছিল, ভদ্দর হয়ে শুবি, সোজা হয়ে ঘুমোবি, বরের গায়ে পা দিস না।" বলিতে বলিতে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষুব্ধ ও গম্ভীর হইল। "তোমার পা দুটো বিছানা থেকে নামাও। পেন্নাম করে রাখি।"

"হ্যাত্...পেন্নাম!"

"না, আমার পাপ হবে। তুমি আমার পায়ে হাত দিয়েছিলে কেন।"

রজনী পালঙ্ক হইতে নামিয়া পড়িল, তাহার পাপের বোঝাটা যেন প্রতি পলে ভারী হইয়া উঠিতেছে। মিথ্যা বলিব না, ব্যাপারটায় মজা যতই লাগুক না কেন, নিজের পদগৌরবে একটা মর্যাদা বোধ করিতেছিলাম।

বাহিরের অস্পষ্ট ভাবটা অতি দ্রুত মুছিয়া সকাল জাগিতেছিল, ঘরের মধ্যে ফরসা ক্রমশই

চারপাশে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। অনেকগুলি কাক জাগিয়া উঠিয়া গাছে গাছে যাওয়া-আসা করিয়া ডাকাডাকি করিতেছে, দূরের রেল-লাইন দিয়া ভোরের মেল গাড়িটা নিস্তব্ধ শান্ত মাঠ-ঘাটকে বাঁশিতে ডাক দিয়া ও গায়ে নাড়া দিয়া চলিয়া গেল।

রজনীর বিলম্ব সহিতেছিল না। সে আমার পা দুটি প্রায় টানিয়া লইয়া একটা প্রণাম সারিয়া ফেলিল। বলিল, "এই, একটা কথা বলব; দিব্যি কর..."

"কিসের দিব্যি?"

"তুমি কাউকে এ কথা বলবে না।"

"কি কথা?"

"আহা, কিছুই বুঝছে না", রজনী মুখটি ভার করিয়া বলিল, "তোমার মাথার দিকে আমার পা হয়ে গিয়েছিল কাউকে কক্ষনো বলবে না। বলতে নেই।"

"বললে কি হবে?"

"তুমি বলবে!"

"না, বলব না। কি হবে বললে জিজ্ঞেস করছি।"

রজনী আমার পানে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকিল; যেন বুঝিতে পারিতেছিল না— আমার জ্ঞানবুদ্ধির এতটা অভাব কেমন করিয়া হইল। বলিল, "লোকে শুনলে আমাকে অসভ্য ভাববে, আমার মা-বাবা গুরুজনকে নিন্দে করবে। বলবে, মেয়েকে সহবত শেখায়নি। শ্বশুরবাড়িতে নিন্দে হলে খুব খারাপ হয়।"

পিত্রালয় হইতে রজনী যে অনেক শিক্ষা লইয়া আসিয়াছে তাহা বুঝিতে আমার কষ্ট হওয়ার কথা নয়। চন্দ্রার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইতেই মা তাহাকে পদে পদে শিক্ষা দিতেন দেখিয়াছি। একদিন চন্দ্রা আমায় আড়ালে বলিয়াছিল: এটা না, ওটা না, অমুক করিস না—বাবা রে বাবা, কিছুই করব না তো বিয়েই বা করব কেন! শ্বশুরবাড়ি না পাঠশালা রে দাদা, বল তো?

কথাটা এখন মনে পড়ায় হাসি আসিল। রজনীকে অভয় দিবার একটা কর্তব্যবোধও যেন আমার জাগিয়া উঠিল, বলিলাম, "তোমায় কেউ নিন্দে করবে না।"

"বলেছে রে তোমায়!"

"দেখছি তো। মা তোমায় খুব আদর করছে।"

"বাবাও। বাবা আমায় বলছেন, তোমার সঙ্গে শুক্রবার রানীগঞ্জে যাব, এখন আর আসব না।"

সংবাদটিতে আনন্দিত হওয়ার মতন কিছু ছিল না। বরং স্ফুটিত সকালটিতে কেমন করিয়া না জানি একটি কাঁটা বিঁধিয়া মনটা খচখচ করিতে লাগিল। আমার মুখটিও কিছুটা ম্লান হইল, বলিলাম, "তুমি একলা যেও, আমি যাব না।"

"ইস্ রে, যাবে না! যেতে হয়...তা জানো! ধুলো-পা করতে জোড়ে যায়!"

"জোড়-বিজোড় জানি না।" জানিয়াও না জানার ঝোঁকে মাথা নাড়িলাম, "তুমি তোমার

মা-বাবা পিসিমার কাছে যাবে তো যাবে। থাকবে তো থাকবে। আমার কি?"

"আমার কী আনন্দটাই হচ্ছে।"

"তুমি...তুমি...তুমি এক নম্বরের সেলফিস জায়েন্ট।"

"কি?"

'সেলফিস জায়েন্ট' শব্দটা মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। সেকেন্ড ক্লাসে ওঠার পর পরই 'সেলফিস জায়েন্ট' গল্পটা আমাদের পড়ানো হইয়াছিল। গল্পটায় আমরা এতই অভিভূত ও মুগ্ধ ছিলাম যে, নিজেদের মধ্যে 'সেলফিস জায়েন্ট' কথাটা প্রকৃষ্ট স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত বুঝাইতে ব্যবহার করিতাম। কথাটা আমাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। রজনী যে কথাটা বুঝিবে না, অত খেয়াল করি নাই। যদিও রজনী বাড়িতে থাকিয়া বাংলা, ইংরাজী, আঁক পড়াশোনা করে তথাপি এই বিশেষ শব্দটি তাহার জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য হওয়াই স্বাভাবিক।

রজনী সামান্য অপেক্ষা করিয়া বলিল, "বলো না, কি বললে!"

বলিব কি বলিব না করিয়া শেষে বলিয়া ফেলিলাম, "তুমি এক নম্বরের স্বার্থপর।"

স্বার্থপরতার অপবাদে রজনীর রাগ বা দুঃখ দেখিলাম না। নির্বিবাদে অভিযোগটা যেন স্বীকার করিয়া রহিল।

ঘরের মধ্যটা ততক্ষণে পরিষ্কার ও ফরসা হইয়াছে। সূর্য ওঠে নাই, উঠিবার উপক্রম

হইয়াছে, আলোর ভাব আসিতেছে।

রজনী সারা রাত্রির অবিন্যস্ত বেশবাস গুছাইতে লাগিল। গায়ের শাড়িটার পাট বলিয়া কিছু আর ছিল না, আঁচলের প্রান্তটি ন্যাতার মতন. মাথার চুলগুলি এলোমেলো, কপালের কাছে গুচ্ছ গুচ্ছ পাতলা চুল, সিঁদুরের লালটা অনেকখানি ছড়াইয়া গেছে।

আমি বলিলাম, "রানীগঞ্জে গিয়ে তুমি আমার কথা কাউকে বলবে না।"

রজনী শাড়ির পায়ের দিকের প্রান্তটা টানাটানি করিয়া পিঠ সোজা করিয়া দাঁড়াইল। আমার দিকে তাকাইয়া অতি অক্লেশে বলিল, "আহা, বলতে যেন আর আমার লজ্জা করবে না।"

ঘরের দরজায় টুক্-টুক শব্দ রইল। রজনী দরজার দিকে তাকাইয়া অনুচ্চ গলায় বলিল, "ঠাকুরঝি...তুমি শুয়ে থাক, যেন ঘুমোচ্ছ, আমি যাই!"

রজনী সকালের আলোয় দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল।

৫

মাঝের দিন দুইটি যেন দুই ঝলক বাতাস, আসিতে আসিতে ফুরাইয়া গেল, ভাল করিয়া স্পর্শলাভ হইল না। এই সময়টুকুর মধ্যেই আমার কিশোরচিত্তে রজনীর জন্য বেশ একটা মায়া পড়িয়াছিল। তাহার অবর্তমান যে আমার

পক্ষে তেমন সুখকর হইবে না ইহা অনুভব করিয়া বোধ করি কয়েকটি নিশ্বাস ফেলিতেও কার্পণ্য করি নাই। কিন্তু রজনী আমার দুঃখে দুঃখী হইল বলিয়া মনে হয় না। পিত্রালয়ে যাওয়ার আনন্দে সে এতই অধৈর্য ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমার বিরসতা তাহার নজরে পড়িল না।

যথারীতি নির্দিষ্ট দিনে রজনীকে লইয়া তাহার পিতৃগৃহে চলিলাম। সঙ্গে মনোহর কাকা ছিলেন। পিতাঠকুর আমাদের জন্য একটা মোটরগাড়ির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু যাওয়ার মুহূর্তে তাহার কল বিগড়াইল। সংসারে অনেক কল বেশ পাকাপোক্ত ভাবে বিগড়ায়, সহজে মেরামত হয় না। আমার দুষ্টবুদ্ধি বলিতেছিল, এই গাড়ির কলটি যেন আপাতত বিকল হইয়াই থাকে। রজনী সাত-সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিয়াছে; তাহার যাত্রার আয়োজন সবই সমাপ্ত, তথাপি উহার ধৈর্য সহিতেছিল না। শরৎ মারফত শুনিয়াছিলাম, গাড়ির আশায় সে নাকি উৎকর্ণ হইয়া চন্দ্রার ঘরে জানালার পাশে বসিয়া আছে। বলিতে আপত্তি নাই, স্বার্থপর ওই বালিকাটির কিঞ্চিৎ শিক্ষা হওয়া উচিত বলিয়াই আমার মনে হইতেছিল।

ক্রমশই বেলা বাড়িতেছিল। বিকল মোটর-গাড়িটির উপর আর ভরসা না রাখিয়া পিতা-ঠাকুর যখন আমাদের ট্রেনযোগে রানীগঞ্জে পাঠানোর বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন তখন

অচল গাড়িটি ভয়ংকর হুঙ্কার ছাড়িয়া তাহার সচলত্বের মহিমা প্রকাশ করিল। মাথায় ক্যাম্বিসের ছাদ, হাড়গিলে সেপাইমার্কা চেহারা এবং বেতের ফিতা জড়ানো পুরানো আমলের চাকাগুলি দেখিয়া গাড়িটির দাপট বোঝা অসাধ্য ছিল।

শরৎ আমার পেটে খোঁচা মারিয়া হতাশার ভঙ্গিতে বলিল, "হুত তোর...!" বলিয়া তাহার দুষ্টহাসি হাসিল, "ব্যাড্ লাক্ তোমার!"

পিতাঠাকুরের মনে একটা সংশয় দেখা দিল, মোটর গাড়িটার যেরকম প্রকৃতি দেখা যাইতেছে তাহাতে মাঝপথে তাহার বিগড়াইবার ষোল আনা সম্ভাবনা; যদি পথের মধ্যে আবার কল বিকল হয় তখন উপায় কি হইবে। এক্ষেত্রে বরং রেলগাড়িতে যাওয়াই নিরাপদ।

,মনোহরকাকা এবং পিতার মধ্যে কি আলোচনা হইল বলিতে পারি না—আমরা মোটর গাড়িতেই আসিয়া চাপিলাম। মাতা-ঠাকুরানী আমাদের শুভযাত্রা করাইয়া দিলেন, পিতাঠাকুর আমাদের আশীর্বাদ করিলেন, গাড়ির চালকটিকে নানা পরামর্শ দিয়া দিলেন। বুঝিলাম, আমরা আপাতত আসানসোল পর্যন্ত এই গাড়িতেই যাইব, সেখান হইতে ট্রেন, অথবা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া রানীগঞ্জ। যদি ইতিমধ্যে এই গাড়ি আর কোনোপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না করে তবে অবস্থা বুঝিয়া সটান রানীগঞ্জে চলিয়া যাইতেও পারি।... গাড়ি ছাড়িল!

মনোহরকাকা সামনে, আমরা পিছনে। রজনীর আকারটি ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে, সে আসিতে যাইতে যতগুলি বাক্স-প্যাঁটরা সংগ্রহ করিয়াছে তাহার পরিমাণ কিছু কম নয়। পিছনের মাল বহনের স্থানটিতে তাহার মস্ত বাক্স এবং একটি বস্তা মাত্র; বাকিটা আমাদের পায়ের তলায় ও আশেপাশে রাখা আছে। রজনীর একটি সুটকেশ, আমার সুটকেশ, নতুন কাপড়চোপড়ের একটি ক্ষুদ্রাকার গাঁঠরি, কয়েক হাঁড়ি মিষ্টি। পিতাঠাকুর কুটুম্বের জন্য বাড়ির বাগানের কিছু আনাজপাতিও দিয়া দিয়াছেন। বস্তাবন্দী হইয়া তাহা পিছনে বাঁধা। গহনার হাতবাক্সটি মনোহরকাকার জিম্মায়।

যাওয়ার পথে ফাল্গুনের রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিল। গ্রাম্য পথ, গাড়িটা পদে পদে লাফ-ঝাঁপ মারিতেছিল, যেন তাহার কেরামতি দেখাইয়া আমাদের কাঁচা পথটিকে সে অবাক করিয়া দিবে। তাহার ফলে নানাপ্রকার আতঙ্ক-জনক শব্দও হইতে দেখিয়া আমার মন্দ লাগিতেছিল না, কিন্তু রজনী তেমন প্রসন্ন হইতে পারিতেছিল না।

আমাদের গ্রাম্যপথটুকুর শোভা রজনী দেখিতেছিল বটে, তবে উপভোগ করিতেছিল বলিয়া মনে হয় না। পলাশঝোপ, শালুক-দীঘি, কার্তিকপুরের পুরাতন অব্যবহৃত দু নম্বর খাদ, ধসা জমি, বনতুলসীর জঙ্গল ইত্যাদি একে একে পার হইয়া গেল, রেল-

লাইনের সাঁকো ছাড়াইয়া পাথুরে রাস্তায় গাড়ি আসিল। এতক্ষণে গাড়িটার চালকও কিছুটা স্বাভাবিক হইয়াছে।

রজনীর অবগুণ্ঠন কখন যেন হ্রস্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহার মুখমণ্ডলে একটা আশ্বাসের ভাব বুঝি এতক্ষণে জাগিয়া উঠিয়াছে।

কয়লাকুঠির একটি হেটো-বাজার পার হইয়া আমরা রেলের ফটকের কাছে আসিলাম। ফটক বন্ধ, গাড়ি দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ দেখি সত্যনারাণ, সাইকেলে চাপিয়া আসিতেছে। সত্য আমার বন্ধু, আমরা একই ক্লাসে পড়ি। সত্য স্কুলে যাইতেছে, তাহার সাইকেলের পিছনে বইপত্র বাঁধা।

মনোহরকাকার জন্য আমরা এতটা পথ নীরবই ছিলাম। তাঁহার সামনে আমাদের কথা বলা যে শোভা পায় না তাহা আমরা উভয়েই যেন কোনো অলিখিত আইন অনুসারে বুঝিয়া লইয়াছিলাম। সত্যকে দেখিতে পাইয়া আমার কিঞ্চিৎ আতংক হইল। সত্য বড় জেঠা ছেলে, গলার স্বরটা মোটা, হাউমাউ করিয়া কথা বলে। সে আমায় দেখিতে পাইলেই গাড়ির সামনে আসিয়া হাজির হইবে। রজনী ও আমাকে এই ভাবে দেখিতে পাইয়া কি যে বলিয়া বসিবে কে জানে! ছেলেটার বোধশোধ বড় কম।

সত্য প্রায় রেল ফটকের কাছে আসিয়া পড়িল। আমার শ্বশুরালয়ে যাওয়ার বাহনটির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যে অবিলম্বে তাহার দৃষ্টি

আকর্ষণ করিবে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। ওই পরম পক্ব ছেলেটি আমাদের একবার দেখিতে পাইলে যে কি ধরনের রগড় করিবে, কিবা বলিবে, স্কুলে গিয়া বন্ধুমহলে কোন গল্প ছড়াইবে তাহা ভাবিয়া আমি এতই উদ্বিগ্ন ও ভীত হইলাম যে, রজনীর হাত ধরিয়া ইশারায় তাহাকে মাথা লুকাইতে বলিলাম। রজনী কিছু বুঝিল না, অবাক-দৃষ্টিতে আমায় দেখিতে লাগিল। আমি যতই তাহাকে ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝাই, আত্মগোপন কর, সে ততই মাথা তোলে ও চারিপাশে তাকায়। মনোহরকাকার জন্য আমার কথা বলার উপায় থাকিল না। রাগ করিয়া রজনীর গায়ে কনুইয়ের একটি গুঁতা মারিয়া রেল-লাইনের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলাম। রজনী 'উঃ!' বলিয়া মৃদু একটা শব্দ করিল এবং পরক্ষণেই আমাকে পালটা ঠেলা মারিল।

সত্য আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। তাহার মুখমণ্ডলে দশদিক আলো-করা একটা হাসি ফুটিল। সে আগাইয়া আসিল।

গাড়ির জানালার কাছে আসিয়া পাজীটা হাঁ করিয়া আমাদের কয়েক মুহূর্ত দেখিল, তাহার চক্ষু দুইটি গোলাকার ও বিস্ফারিত, মুখে মজাদার হাসি।

"কো—কো কোথায় যাচ্ছিস?" সত্য রগুড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করিল। সে সামান্য তোতলা।

"রানীগঞ্জ।"

"শ্ব...শ্বশুরবাড়ি!" সত্য এমন একটা

নিঃশব্দ হাসি হাসিল যেন শ্বশুরবাড়ি জায়গাটা ময়রার দোকানের মস্ত একটা রসগোল্লার পাত্র।

আমি মুখচোরা হাসি হাসিয়া অন্য প্রসংগ তুলিবার চেষ্টা করিলাম, "স্কুলে চললি?"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি। তো...তোর আর কি...মজাসে আছিস।"

মনোহরকাকার সামনে গাধাটা আর কি বলিয়া বসে সেই ভয়ে আমি তটস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, "পশুপতি স্যার কি অংক করাচ্ছেন রে!"

"প...প...প্র...প্রফিট অ্যা...অ্যান্ড লস...।" কথাটা বলিতে সত্যকে একটু বেশীমাত্রায় কষ্ট করিতে হইল। কিন্তু ওই কষ্টটুকুর জন্য তাহার চোখমুখের ভাব অতটা রক্তাক্ত হওয়ার কথা নয়। বোধ করি অপরিচিত একটি কিশোরীর কাছে তাহার তোতলামির জন্য সে বিশেষ লজ্জা পাইয়াছে।

উহার লজ্জাকে আমি যেন দেখি নাই, বলিলাম, "আমার অনেক কামাই হয়ে গেছে রে। ফিরে এসে স্কুলে যাব।"

"যা-যাস।" বলিয়া সত্য কি যেন ভাবিল, তাহার পর বলিল, "তুই—তুই এক্...ক্কে-বারে কার্ত্তিক হয়ে গেছিস! কার্ত্তিক ঠাকুর...!"

মনোহরকাকা ঘাড় ফিরাইয়া সত্যকে দেখিলেন। আমি বিপদ গণিতেছিলাম। ইশারায় তাহাকে মনোহরকাকাকে দেখাইলাম।

সত্য একপলক মনোহরকাকাকে দেখিয়া

লইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন।...যা, শব...শবশুরবাড়ির আদর খেয়ে আয়। চ—চলি!" সত্য তাহার ফাজিল চোখে আমায় এবং রজনীকে দেখিয়া লইয়া সাইকেলের ঘণ্টা মারল।

রেল ফটক খুলিতেছিল, আমাদের গাড়ি-টিতে স্টার্ট দিবার আয়োজন চলিল, সত্য সাইকেলে চাপিয়াছে। মনোহরকাকা অবশ্য আমায় কিছু শুধাইলেন না।

গাড়ি চলিতে শুরু করিলে রজনী মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাসি চাপিতেছিল। তাহার হাসির কারণটা বোধগম্য হইতেছিল না। সপ্রশ্ন চোখে তাকাইয়াও কোনো প্রত্যুত্তর লাভ করিলাম না। অথচ তাহার হাসির কারণটা না জানায় কেমন অস্বস্তি হইতেছিল।

চোখে চোখে প্রশ্ন করিলাম, শব্দ না করিয়া মুখ নাড়িয়া শুধাইলাম, হাসছ কেন?

মনোহরকাকাকে আড়চোখে লক্ষ করিয়া রজনী তাহার অবগুণ্ঠনের একটু আড়াল দিল, তাহার পর ঠোঁট নাড়িয়া কি বলিল। তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারিলাম না। আমি বার বার ঠোঁট নাড়িয়া শুধাই: কি—? রজনীও ঠোঁট নাড়ে।

শেষে সে আমার হাতটা তাহার কোলের উপর টানিয়া লইয়া তালুর উপর তাহার পাতলা আঙুল বুলাইয়া কি যেন লিখিতে লাগিল। বার কয়েক লেখার পর বুঝিলাম আমার কার্তিকঠাকুর নামটি তাহার বিশেষ পছন্দ

হইয়াছে।

মনোহরকাকার পিছনে থাকিয়া আমরা অতঃপর একে অন্যের হস্তের উপর আঙুলের লেখা লিখিয়া এবং ঠোঁটমুখ নাড়িয়া নিঃশব্দ বাক্যালাপ করিতে করিতে পথ চলিলাম। অবশ্য উহারই মধ্যে আঙুল টানা, চিমটি কাটা, খোঁচা মারাও মাঝে মাঝে চলিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে জি. টি. রোড ধরিয়া গাড়িটা আগাইয়া চলিল। রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিতেছে, বাতাস কিছুটা উষ্ণ, মাঠে-ঘাটে কেমন একটা রিক্ততা ছড়ানো, কোথাও কিছু পাখি জুটিয়া শস্যশূন্য মাঠে খাদ্যকণা খুঁটিতেছে।

রজনী বুঝি অবেলার ঘুমে সামান্য টলিয়া পড়িতেছিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়া জাগাইয়া দিলাম। আসানসোল শহর আসিয়া গেল।

মনোহরকাকা বাজারে গাড়ি দাঁড় করাইলেন। চা, পান, তামাকের নেশা তাঁহার তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। গহনার বাক্সটি আমাদের জিম্মায় দিয়া তিনি চা-তৃষ্ণা মিটাইতে গেলেন। ড্রাইভারবাবুও চায়ের দোকানের দিকে হাঁটা দিলেন।

রজনী মাথার ঘোমটা খসাইয়া অধৈর্যস্বরে বলিল, "তেষ্টা পেয়েছে...জল খাব।"

সামনেই পানের দোকান। বলিলাম, "লেমনেড খাবে?"

"টক-মিষ্টি জল! বড্ড ঝাঁঝ..."

"লেমনেড-এ আবার ঝাঁঝ কোথায়! সে

সোডায় থাকে।"

"পয়সা আছে তোমার?"

"আছে।"

"তা হলে খাব।"

রজনীকে গাড়িতে রাখিয়া নামিয়া আসিলাম। সে গহনার বাক্স কোলে করিয়া বসিয়া থাকিল। একাকী তাহাকে হয়ত ঈষৎ উদ্বিগ্ন দেখাইতেছিল।

লেমনেড খাইতে গিয়া রজনী গা গলা খানিকটা ভিজাইল, চোখমুখের বিদঘুটে ভঙ্গী করিয়া বার কয়েক ঢেঁকুর তুলিল। শেষে বলিল, "মুখটা কেমন কেমন করছে।... বিচ্ছিরি।"

"পান খাবে?"

রজনী সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলাইয়া তাহার সাগ্রহ সম্মতি জানাইল, পরক্ষণেই বিরস মুখ করিয়া বলিল, "উনি রয়েছেন যে—!" উনি অর্থে মনোহরকাকা।

মনোহরকাকা তখনও ফেরেন নাই, ড্রাইভারবাবুও নয়; কাজেই এ-সময় একটা পান রজনী মুখে পুরিয়া লইলে কে বা তাহা জানিতে পারিবে! আর মনোহরকাকার পিছনে থাকিয়া ঘোমটার আড়ালে রজনী তাম্বুল চর্বণ করিলে নিশ্চয় তাহা কাকার দৃষ্টিগোচর হইবে না। রজনীকে এই সহজ সত্যটা বুঝাইয়া দিলাম।

রজনী খুশী হইল। বলিল, "ছুটে নিয়ে এস। তুমি খেও না। শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছ।" তাহার উপদেশ দিবার ভঙ্গীটি গুরুজনের

মতনই। হাসিয়া ফেলিলাম।

আমাকে যাইতে দেখিয়া রজনীর কি যেন মনে পড়িল, বলিল, "পানের মধ্যে সেই দিয়ে আনতে পারবে—ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা—কনকন করে—" বলিতে বলিতে জিবের ঠাণ্ডা লাগার ইস্-ইস্ একটা শব্দ করিল।

"পিপারমেণ্ট?"

"হ্যাঁ—" রজনী মাথা নাড়িল।

পানের দোকান হইতে রজনীর জন্য দু-খিলি পান লইলাম। একটিতে পিপারমেণ্ট, অপরটিতে সামান্য জর্দা। উহাকে জর্দা খাওয়াইবার দুষ্ট মতলব আমার কেন হইল জানি না। হয়ত রজনীকে একটু জব্দ করার ইচ্ছা আমার ছিল।

গাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া রজনীর হাতে পিপারমেণ্ট দেওয়া পানটি দিয়া বলিলাম, "এটা এখন খাও। আরেকটা আছে, রানীগঞ্জে পেঁৗছে খেও।"

রজনী পিপারমেণ্টযুক্ত পান মুখে দিয়া মহানন্দে চিবাইতে লাগিল। জর্দা দেওয়া পানটি শেষপর্যন্ত আর তাহাকে খাইতে হয় নাই। পাছে একটা কেলেঙ্কারী হয় এই ভয়ে আমি পানটির রহস্য ফাঁস করিয়া দিই।

শ্বশুরালয়ে আমাদের অভ্যর্থনাটা বেশ জাঁক করিয়াই হইল। শঙ্খ ও উলুধ্বনি, সামান্য কয়েকটি পারিবারিক আচার—ইহা তেমন ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু রজনীদের বাড়ির গুরু ও লঘুজনেরা যেভাবে আমার আদর

আপ্যায়নে লাগিয়া গেল তাহাতে নিজের একটা মর্যাদা আবিষ্কার করিয়া আমি বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছিলাম। হাঁটিতে চলিতে বসিতে পাঁচদিক হইতে যেন পাঁচজনে ছুটিয়া আসে। রজনী অপেক্ষা আমার আদরটা যে বেশী হইতেছিল তাহাতে আমি আরও খুশী হইয়া উঠিতেছিলাম। আমাদের গৃহে গত কয়েকটা দিন রজনীর বড়ই আদর দেখিয়াছি; পিতাঠাকুর, মাতাঠাকুরানী, চন্দ্রা—সকলেই নিজেদের ঘরের ছেলেকে ভুলিয়া গিয়া অন্যের গৃহের কন্যাকে লইয়া মত্ত ছিলেন; এই এক-দেশদর্শিতার প্রতিবিধান আপাততঃ রজনী-দের গৃহে দেখিতে পাইতেছি।

রজনীদের আত্মীয়স্বজনেরা বিবাহের পর প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিলেন, থাকার মধ্যে ছিলেন নলিনীদিদি, ছোটপিসি, মামিমা—প্রভৃতি কয়েকজন। নলিনীদিদির স্বামী প্রভাতদাদাও ছিলেন। বিবাহের সময় প্রভাত-দাদাকে বাহিরের কাজকর্মে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে, আমার সহিত তাঁহার পরিচয়টা তেমন হয় নাই। তিনি আমাদের বাড়ির নিমন্ত্র-ণেও যাইতে পারেন নাই, সর্দিজ্বরে কাবু হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইল।

প্রভাতদাদা মজাদার মানুষ। বর্ধমান মেডি-কেল স্কুলের শেষ পরীক্ষাটা ডিঙাইতে সাত না আটবার সময় লাগিয়াছে। সদ্য তিনি সেই পরীক্ষা পাস করিয়া মেডিকেল স্কুলেই বহাল

আছেন। নাদুসনুদুস চেহারা,—গায়ের রং অতিরিক্ত ফর্সা, মাথায় কিঞ্চিৎ খাটো। অনুমান করি তাঁহার বয়স সাতাশ আটাশ হইয়াছে। প্রভাতদাদাদের ঘরবাড়ি বর্ধমানেই, সচ্ছল পরিবার, কয়েকটি কারবারও আছে, অতএব প্রভাতদাদার মেডিকেল পড়া নিতান্ত যেন গুরুজনের আদেশ-রক্ষা।

প্রভাতদাদাই আমার তত্ত্বাবধানের ভারটা বেশী করিয়া লইয়াছিলেন। এবং অনর্গল তাঁহার নানাপ্রকার গল্প বলিয়া আমায় অভিভূত করিতেছিলেন।

স্নান খাওয়াদাওয়ার পর আমরা আমাদের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। দোতলার এই ঘরটি আমার জন্য নির্দিষ্ট। আকারে তেমন কিছু বড় নয়, কিন্তু চারপাশ খোলামেলা। খড়খড়ি দেওয়া জানালা দরজা। বাহিরের সরু লম্বা বারান্দার গায়ে একজোড়া নারিকেল গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ঘরটিতে আসবাবপত্রের অভাব ছিল না; পালঙ্ক, কাঁচদেওয়া আলমারি, আয়না, টেবিল-চেয়ার, ঠাকুরদেবতার ছবি, ফটো, সূচীকার্য। একটি সূচীকার্য প্রথমাবধি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল, সবুজ ও লালবর্ণের একটি পাখি ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে, তলায় আঁকাবাঁকা হরফে লেখা: 'যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভুলে না মোরে।'

আমরা ঘরে আসার পর প্রভাতদাদা দরজাটা ভেজাইয়া দিয়াছিলেন; বলিলেন, "নাও, একটু জিরিয়ে নাও।"

আমি পালঙ্কে বসিলাম না, দাঁড়াইয়া রহিলাম। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া অদূরে একটা জলজ-পাতা ছাওয়া পুকুর দেখা যাইতেছিল। পুকুরটির লাগোয়া বাগানে গাছ-গাছালির ছায়া। ঘুঘুর ডাকে দ্বিপ্রহরের আলস্যভাবটি ক্রমশই নিবিড় হইয়া আসিতেছে।

প্রভাতদাদা পকেট হইতে সিগারেটের প্যাকেট ও ম্যাচ বাহির করিলেন। পালঙ্কের উপর পা দুলাইয়া বসিয়া পরম সুখে একটা সিগারেট ধরাইলেন; বলিলেন, "ছোটবাবুর হবে নাকি একটা?" সিগারেটের প্যাকেটটা তিনি সহাস্য সকৌতুকে আমার দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

লজ্জায় চোখমুখ আরক্ত হইল। মুখ নীচু করিলাম।

প্রভাতদাদা বলিলেন, "তুমি একেবারে নাবালক বেম্মচারী..."—বলিয়া মোটা গলায় হাসিলেন। "বুঝলে ছোটবাবু, আমি তোমার বয়সে পড়ার ঘরে ধুনো দিয়ে সিগারেট খেতাম।"

ভেজানো দরজা ঠেলিয়া নলিনীদিদি আসিলেন, হাতে পানের ছোট রেকাবি।

প্রভাতদা আগেভাগে পান তুলিয়া লইলেন। নলিনীদিদি আমার মুখের সামনে রুপার রেকাবিটি ধরিয়া দিলেন. "নাও ভাই।"

"ওমা, সে কী! বাড়িতে জামাই এসেছে একটা পানও মুখে দেবে না! নাও, খাও... খেতে হয়, বুঝলে গো। এই পান চিনি

সেজেছে, দেখো না খেয়ে...”

“খেয়ে ফেল, ছোটবাবু—” প্রভাতদাদা বলিলেন, “শ্বশুরবাড়িতে কিছু পাতে ফেলতে নেই—।” প্রভাতদাদা নলিনীদিদির মুখপানে চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন।

একটা পান খাওয়ার সাধ যে আমার না ছিল এমন নয়, পান লইলাম। তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পান চিবাইতেছি, নলিনীদিদি হাসিয়া শুধাইলেন, “কেমন সেজেছে?”

লজ্জিত মুখে অধোবদন হইলাম।

প্রভাতদাদা সরঙ্গে বলিলেন, “বেশ সেজেছে, খাশা; তোমার মতন মশলাদার...”

নলিনীদিদি ভ্রূকুটি হানিয়া প্রভাতদাদাকে ভর্ৎসনা করিলেন। “ছেলেমানুষের সামনে কি কথা!” বলিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন, “ওই লোকটার সঙ্গে বেশী মিশো না ভাই, তোমায় গোল্লায় পাঠিয়ে দেবে—।”

প্রভাতদাদা জবাব দিলেন, “কে কাকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে নলিনী, তা ভগবানই জানেন। বুঝলে ছোটবাবু, মেডিকেল স্কুলে ঢুকে বিয়ে করেছিলাম, সাত বচ্ছর হল, লক্ষ ডাক্তার হতে এত দেরী হল শুধু তোমার নলিনীদিদির জন্যে। সে হিস্ট্রি তোমায় বলব একদিন, আর-একটু বয়স বাড়ুক।”

নলিনীদিদি কটাক্ষ হানিয়া স্বামীর দিকে এক খিলি পান ছুঁড়িয়া মারিলেন, তিনি আর দাঁড়াইলেন না। প্রভাতদাদা হাসিতে

লাগিলেন।

আমি প্রভাত-নলিনীর যুবজনোচিত প্রণয় ও রসালাপ পূর্ণমাত্রায় না বুঝিলেও উভয়ের মধুর সম্পর্কটা কোনো গোপন ইন্দ্রিয়ে অনুভব করিয়া বিচিত্র এক আনন্দ পাইলাম।

দ্বিপ্রহরের বিশ্রামকালে প্রভাতদাদা আমায় বর্ধমান শহরের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করিলেন। পরামর্শ দিলেন, ম্যাট্রিকটা পাস করিয়াই যেন বর্ধমানে চলিয়া যাই; সেখানকার রাজকলেজ বিখ্যাত। বাঁকুড়া যে একটা শহরই নয়, কুষ্ঠরোগীর ভিড়ে ভর্তি এবং কৃশ্চান কলেজের যতটা নামডাক ততটা যে তাহার যোগ্যতা নাই। ..বর্ধমান বাঁকুড়ার তুলনামূলক আলোচনা শুনিতে শুনিতে আমার তন্দ্রা আসিল, প্রভাতদাদাও চক্ষু মুদিলেন।

বন্যারা বনে এবং শিশুরা মাতৃক্রোড়ে কতটা সুন্দর তাহা আমি বাংলা ক্লাসে গড়গড় করিয়া বলিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু রানীগঞ্জে আসিয়া রজনীর যে-রূপ দেখিলাম তাহাতে আমার ধারণা হইল সঞ্জীবচন্দ্র বালিকাবধূর পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের সৌন্দর্যটা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বন্যারা বনে যতটা সুন্দর, কিশোরী বিবাহিত কন্যার পিতৃগৃহে অবস্থান তাহা অপেক্ষা কিছু কম সুন্দর নয়। স্ব স্ব ক্ষেত্রে উভয়েই যেন তাহাদের স্বাভাবিক জীবনটি ফিরিয়া পায়।

রানীগঞ্জে আসিয়া রজনীর বধূমূর্তিটি

খসিয়া গেল। এই কয়দিন সাজসজ্জায় আচার-আচরণে তাহাকে একটি অনভ্যস্ত ভূমিকা অভিনয় করিতে গিয়া পদে পদে যে-বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছিল—পিতৃগৃহে পদার্পণ করামাত্র যেন তাহার ভার হইতে সে মুক্ত হইল। সে আমার সাক্ষাতে না আসিলেও তাহার সাড়া আমি পাইতেছিলাম। তাহার আত্মীয়ারা তাহাকে লইয়া কৌতুক করিতেছেন এবং সেই কৌতুকে রজনী কেমন করিয়া কৌতুকপ্রদ হইয়া উঠিতেছে আভাসে আমি তাহা জানিতে-ছিলাম। উহার সখীরা আসিয়া ঘিরিয়া ধরিলে রজনী কোমরে কাপড় জড়াইয়া নীচের পেয়ারা গাছের ডালে চড়িয়া বসিয়া কিভাবে গল্পে মাতিল তাহাও আমার লক্ষে পড়িল। রজনীর চিকন গলার স্বর, তাহার তর্জনগর্জন, হুড়া-হুড়ি আমার কিছু কিছু কর্ণগোচর হইল। অবশ্য সে একটিবারও আমার সামনাসামনি আসিল না।

অপরাহ্নবেলায় প্রভাতদাদা আমাকে লইয়া শহর-ভ্রমণে বাহির হইলেন। দোকান-পসার ও মানুষজন দেখিয়া আমরা যখন ফিরিতে-ছিলাম তখন প্রভাতদাদা নলিনীদিদির জন্য জর্দা কিনিলেন। রজনীর জন্য এক শিশি পিপারমেণ্ট কেনার সাধ হইল। প্রভাতদাদার নিকট হইতে ছুতা করিয়া সরিয়া গিয়া আমি আমার মন-সাধ পূর্ণ করিলাম।

সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটিল। আমার ঘরটিতে পুনরায় একটি বাসর বসিয়াছিল বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। বাড়ির গুরুজনেরা উঁকিঝুঁকি দিয়াই সরিয়া গেলেন, নলিনীদিদি ও তাঁহার সমবয়সী দু-একজন, রজনীর সখীবৃন্দ, সেই তিনবারে ম্যাট্রিক-পাস-করা মধুদা ও দুই-একজন ছেলেছোকরা থাকিল। নলিনীদিদি হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিলেন, 'ওই দেখা যায় কালো পাখী, ও তার কালো দুটি পাখা; লোকে তারে কোকিল বলে বসন্ততে দেয় গো দেখা।' প্রভাতদাদা শখের ম্যাজিশিয়ান, তাঁহার হাত সাফাইয়ের খেলা ও রঙ্গ রসিকতা শুরু হইল। ওই সহাস্য সরব হাটের মধ্যে প্রভাতদাদা আমার নাক টিপিয়া টাকা বাহির করিলেন, রজনীর কোল হইতে হংসডিম্ব। হাসাহাসির ধুম পড়িয়া গেল। অবশেষে তুরুপের টেক্কার মত আমার পকেট হইতে রজনীর জন্য কেনা পিপারমেণ্টের শিশিটাও সভাস্থলে বাহির করিয়া দিলেন। হাসির দমক বহিল। লজ্জায় আরক্ত হইয়া অধোমুখে বসিয়া থাকিলাম; রজনী ছুট মারিয়া পালাইল।

রাত্রে রজনী অবশ্য আমার পাশে বসিয়া আমারই দেওয়া পিপারমেণ্ট-যুক্ত পান চিবাইতে চিবাইতে পরম বিজ্ঞের মতন বলিল, "তুমি একেবারে কাঁচকলা।"

আমার প্রতি রজনীর এমন একটি উদার ধারণা কি করিয়া জন্মিল তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম না। পিপারমেণ্টের শিশিটা সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাওয়াতেই যে অত অনাসৃষ্টি

ঘটিয়াছে তাহা বুঝিলাম। সেই সাধের শিশিটা রজনীর হাতে: শিশির ছিপি খুলিয়া সবেমাত্র তাহার পানে পিপারমেণ্ট লাগাইয়া মুখে পুরিয়াছে। মাথার চুলের কাঁটা দিয়া পিপার-মেণ্ট লাগানোর পদ্ধতিটা সে কোথায় শিখিয়াছে কে জানে!

বলিলাম, "প্রভাতদাদার চারটে চোখ।"

রজনী পিপারমেণ্টের শিশিটা তাহার অভ্যস্ত তেঁতুলবীচি লইয়া খেলা করার মত ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লুফিতেছিল। ইহাও তাহার এক মুদ্রাদোষ বুঝি। রজনী বলিল, "ঠিক হয়েছে, সবাই তোমায় বেহায়া ভাবল! ডেঁপো ছেলে ভাবল।"

কথাটা শ্বশুরমহাশয় ও মনোহরকাকার কান পর্যন্ত গিয়াছে কি না জানার জন্য উদ্বেগ বোধ হইল। বলিলাম, "মাকে বলেছে?"

"মা ঠিক শুনতে পাবে।"

"মনোহরকাকা, শ্বশুরমশাই!"

"জানি না অত।"

সামান্য রাগ হইল। রজনীর জন্যই এই বিড়ম্বনা; সে যদি পান খাওয়ার জন্য লালায়িত না হইত তবে আর বিপদটা ঘটিত না। বলিতে কি, তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং পরিবারের অন্যান্যের মতন সে পানের নেশায় পাকিয়া উঠিতেছে। বলিলাম, "এক রত্তি মেয়ের অত পান খাওয়া কি! দাঁতে ছোপ পড়ে যাবে, পোকা হবে।"

"বউ মেয়েরা পান খেয়েই থাকে।"

"তুমি বউ না ইয়ে—" বলিয়া আমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলাম।

রজনী সঙ্গে সঙ্গে আমায় জিভ ভেঙচাইয়া বলিল, "তুমিও বর না আমার কাঁচকলা।... একটা এতটুকু শিশি লুকিয়ে রাখার মুরোদ নেই, বর হয়েছে!...আবার সেকেন্ড কেলাসে পড়ে—আ-হা রে..." রজনী মাথা নাড়িয়া এমন একটা ভেঙানোর ভঙ্গি করিল যে আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

"আবার হাসে!" রজনী ভর্ৎসনা করিল।

"ঠিক হ্যায়।..কাল আমি চলে যাব, তারপর তুমি..."

"সবাই যায়। জামাইরা কি শ্বশুরবাড়িতে বসে থাকে!" রজনী পরম নির্বিবাদে বলিল।

বোধ করি বড়ই আহত হইলাম। দ্বিতীয় কথা না বলিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত হইয়াছিল। রজনী বারান্দার দিকের খড়খড়ি-দরজাটাও বন্ধ করিয়া বাতি নিবাইয়া আসিয়া বিছানায় বসিল। তাহার পর আমাকে ঠেলা মারিয়া বলিল, "আমি দেওয়ালের দিকে শোব। জানালার দিকে তুমি যাও।"

"তুমি এপাশে শোবে— ; আমার বাঁ পাশে...।"

"না। এদিকে তুমি শোবে। এখান থেকে ওই নারকেল গাছ দেখা যায়...।"

"ভূত আছে ওখানে!"

রজনী কোনো উত্তর দিল না, যেন সেটা বাহুল্য। দুহাতে প্রাণপণে আমায় টানিতে লাগিল। স্থান পরিবর্তন করিয়া শুইয়া

পড়িলাম। সামান্য পরেই সম্ভবত ভৌতিক আশঙ্কায় রজনী আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া এবং যতটা সম্ভব গায়ের কাছে ঘন হইয়া আসিল। তাহার মুখ হইতে পিপারমেণ্টের সুন্দর গন্ধ আসিতেছিল।

পরদিন সকালটা কাটিল। তাহার পরই যাত্রার আয়োজন চলিল। স্নান, খাওয়া শেষ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছি। বেলা দুইটা নাগাদ ট্রেন। আমাদের ট্রেনেই ফেরার কথা। মনোহরকাকাও প্রস্তুত হইয়াছেন। রজনীকে সকাল হইতে দেখি নাই, তাহার সাড়াশব্দ অবশ্য কখনও-সখনও পাইয়াছি।

সবই যখন প্রস্তুত, তখন নলিনীদিদি আমায় ঠাকুরঘরে যাওয়ার জন্য ডাক দিয়া গেলেন। অন্দর মহলের দিকেই যাইতেছিলাম, হঠাৎ এক অদৃশ্য কোণ হইতে রজনী আসিয়া আমার জামা ধরিয়া টান মারিল। চোখমুখের ইশারায় আমায় আহ্বান করিয়া সে পাশের সিঁড়ি দিয়া পালাইল। আশেপাশে কেহ ছিল না, আমি সিঁড়ির পথ ধরিলাম।

দোতলার ছাদের কাছে, চিলে কোঠার নীচে অল্প একটু স্থান; সিঁড়িরই চওড়া ধাপ একটা। রজনী দাঁড়াইয়াছিল, মাথায় বিন্দুমাত্র কাপড় নাই।

আমায় দু পলক দেখিয়া লইয়া রজনী বলিল, "রেলগাড়িতে সাবধানে যাবে। স্টেশনে স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালে নামবে না। বুঝলে—!"

তাহার এই গুরুজনসুলভ উপদেশে হাসিয়া

বাঁচি না। বোধ করি রজনীকে কেহ স্বামী-সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া এই উপদেশটি দিবার শিক্ষা দিয়াছে অথবা এই ধরনের উপদেশ দেওয়াই যে রীতি তাহা সে দেখিয়াছে।

"হাসা হচ্ছে যে!"

"কই!"

"আমার আর চোখ নেই...বাড়ি গিয়ে ঠাকুর-ঝিকে কিছু বলবে না।"

"কি বলব না?"

"কিছু বলবে না। পিপারমেণ্টের কথা কখ্‌খনো নয়।"

মাথা নাড়িলাম; বলিব না। অবশ্য নিষেধ না করিলেও বলিতাম বলিয়া মনে হয় না।

দু মুহূর্ত কি ভাবিয়া লইয়া রজনী বলিল, "রোজ স্কুলে যাবে, মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। ফাঁকি মারলে নিজেই ভুগবে।" বলিতে বলিতে রজনীর মুখের ভাব ও গলার স্বরের পরিবর্তন হইল। তাহার নিতান্ত সরল সহাস্য মুখটিতে কেমন একটা বিষণ্ণতা নামিল, বাক্‌পটু ওষ্ঠ দুটি স্তব্ধ হইল ক্রমশ তাহা যেন ঈষৎ ফুলিয়া উঠিতেছিল।

নীচে আমার ডাক পড়িয়াছে। রজনী অতি দ্রুত তাহার আঁচলে লুকানো ডান হাতটি বাহির করিয়া আমার হাতের মুঠায় একটি পান দিল। বলিল, "গাড়িতে খেও।" বলিয়া সে তরতর করিয়া নামিয়া গেল।

পানটিতে রজনী পিপারমেণ্ট দিয়াছিল।

৬

আমার পিতাঠাকুর প্রণীত 'কৈশোর বিবাহ ও সমাজহিত' গ্রন্থটির কথা এক্ষণে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই বয়সে গ্রন্থটির সহিত আমার সম্বন্ধ থাকার কথা নয়। শরৎ অবশ্য দুই-চার পৃষ্ঠা পড়িয়াছিল। কন্যা-দানের সাথে সাথে পিতাঠাকুর তাঁহার বেহাইমশাইকে একখানি 'কৈশোর বিবাহ' প্রদান করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার মতামত ও বক্তব্যগুলি কন্যা ও জামাতার ক্ষেত্রে পালন করা হউক। সেই সুযোগে গ্রন্থটা শরতের হাতে পড়ে, এবং কয়েকটা পাতা পড়িয়া শরৎ তাহা কোনো গোপন স্থানে লুকাইয়া ফেলে। আমার বিবাহের পরদিন হইতেই শরৎ মিটিমিটি হাস্য শুরু করিয়াছিল। সে-হাসির প্রতি আমি তেমন মনোযোগ দিই নাই।

রানীগঞ্জ হইতে আমি ফিরিয়া আসার পর শরতরা নিজ গৃহে চলিয়া গেল। চন্দ্রার যাওয়ার ব্যাপারে পিতামহাশয়ের তেমন মত ছিল না, কিন্তু শরতের বাড়ি হইতে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তাহাদের নববধূকে এ-সময় পিত্রালয়ে রাখিতে চাহে না। অগত্যা পিতাঠাকুর রাজী হইতে বাধ্য হইলেন। যাওয়ার পূর্বে শরৎ আমার পিতার গ্রন্থ সম্পর্কে দু-চার কথা বলিয়া গেল।

উহারা চলিয়া যাওয়ার পর আমি পিতামহাশয়ের গ্রন্থটি চুরি করিলাম। লুকাইয়

লুকাইয়া খানিকটা পাঠ করিয়া ফেলিয়া বুঝিতে পারিলাম শরৎ কেন হাসিত। বলিতে বাধা নাই, জগতে অনেক বেদনাদায়ক গ্রন্থ আছে বটে, তবে কিশোর বয়সে যাহারা বিবাহ করে তাহাদের পক্ষে আমার পিতামহাশয়ের গ্রন্থটি পাঠ না করা উচিত। ইহার আঘাত বড়ই হৃদয়ে বাজে।

আমাদের সমাজটা যে কোন অতলে তলাইয়া যাইতেছে তাহার বিবরণ পিতামহাশয় যেরূপ দিয়াছিলেন আমি তাহার পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না। মোট কথা এই যে, আমাদের গৃহ-গুলিকে যদি সুখনীড় করিতে হয়, যদি পারিবারিক মঙ্গল, সাংসারিক কল্যাণ আমাদের অভিপ্রেত হয়, তবে সংসারের মধ্যে নারী-পুরুষে একটা সুস্থ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ কৈশোর বয়সে পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। বয়স্ক নরনারীর বিবাহে হৃদয়ের সম্পর্ক তেমন থাকে না, প্রাণের যোগা-যোগ যথোচিত হয় না, প্রণয় নামক পদার্থটা যৌবনের তাপে দাবদাহের মতন দগ্ধ করে মাত্র, দীপশিখার মতন জ্বলে না। পিতামহা-শয়ের মতে, কৈশোর কালে বিবাহ দাও, দেখিবে সংসার স্বর্গ হইয়াছে; হৃদয় বলো, প্রাণ বলো, মায়া মমতা বলো, প্রণয়, কর্তব্যজ্ঞান, উদারতা বলো, সুস্থতা বলো—সবই হাতে ধরা দিবে।

সমাজ সংসার মঙ্গল অমঙ্গল সম্পর্কে আমার তেমন একটা জ্ঞান সে-বয়সে থাকার কথা নয়, যাহার শক্তিতে মনে মনে অন্তত

পিতৃবাক্যের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ তুলিতে পারি। বলা বাহুল্য, আমি স্বীকার করিয়া লইলাম, কৈশোর বিবাহটা উত্তম বস্তু, ইহার দ্বারা সমাজ সংসার যথেষ্ট উপকৃত হইবে। কিন্তু বুঝিলাম না, রজনী এবং আমি ত্রিশ চল্লিশ মাইল ব্যবধানে থাকিয়া কোন্ মধুর সম্পর্কটা গড়িয়া তুলিতে পারিব।

পিতামহাশয়ের ধারণা, কিশোর বয়সে কোমলমতি বালক-বালিকার জ্ঞানবুদ্ধির উন্মেষ হইতে থাকে, তাহাদের অন্তঃকরণটি তখন সতেজ ও নির্মল; স্বাভাবিক একটা উদারতা ও ভক্তিশ্রদ্ধা বর্তমান থাকে। এই বয়সে বিবাহ ঘটাইলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা মধুর হয়। উহাদের ভিতর প্রথমে যে সম্পর্কটা স্থাপিত হইবে তাহা ভ্রাতাভগ্নীর অনুরূপ। একে অপরকে স্নেহ করিতে শিখিবে, উভয়ের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইবে, পরস্পরের মধ্যে দুষ্টতা ও শিষ্টতার স্বাভাবিক ইচ্ছা জাগিবে, দুই-চারিটা কিলচড়ও যেমন চলিবে, তেমন একে অন্যের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া দুঃখে সান্ত্বনা দিবে। এইভাবে যে আন্তরিক সম্পর্কটা গড়িয়া উঠিবে তাহা যৌবনকালে যথার্থ প্রেমের হইয়া উঠিবে, দেহের তাড়না হৃদয়টাকে মলহীন করিতে পারিবে না। কৈশোর ও যৌবনের তহবিলে যা গচ্ছিত থাকিবে, তাহার যোগফলে প্রবীণ অবস্থাটা দিব্য কাটিয়া যাইবে।

যুক্তিগুলিতে বেশ একটা জোর দিয়া পিতাঠাকুর সেকালের মনীষীদের জীবনী আলো-

চনাও করিয়াছেন। বঙ্কিম, নবীন প্রভৃতির কৈশোর বিবাহের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকর্তা ভাবিয়া দেখেন নাই, মাটিতে আগুন রাখিয়া গাছের মাথায় হাঁড়ি ঝুলাইয়া রাখিলে চালগুলি ফুটিয়া ভাত হয় না। রজনীর সহিত আমার সম্পর্কটা দুই-চারি বৎসর ভ্রাতাভগ্নীর অনুরূপ থাকিবে তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল, যেটুকু সান্নিধ্য জুটিয়া গিয়াছে তাহাও যে বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারের কল্যাণে, তাহাও বোধগম্য হইল, কিন্তু আমরা দুইজনা দুই প্রান্তে থাকিয়া কি করিয়া সেই সম্পর্কটা গড়িব তাহা বুঝিলাম না।

কয়েকটা দিন মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অরুচির ভাব থাকিল, থাকিয়া থাকিয়া সকালে বিকালে সন্ধ্যায় রজনীর কথা মনে পড়িতেছিল। সকালে বইখাতা খুলিয়া পড়িতে বসিয়া উদাস হইয়া কাকের ডাক শুনিতাম, শুনিতে শুনিতে মনে হইত আমাদের বাড়িটা বড় ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। স্কুলে কখনও-সখনও অন্যমনস্ক হইয়া জানালা দিয়া তাকাইয়া থাকিতাম, সামনে কারখানার ফোয়ারা-ট্যাঙ্ক, সার সার লোহার পাইপ হইতে অবিরল জলের ফোয়ারা উঠিতেছে, দিনমানে সর্বক্ষণ একটা রামধনু দেখা যায়, আমি অকারণে সেই ফোয়ারা দেখিতাম। রাত্রে আলোর সামনে পড়িতে বসিয়া রাফ খাতার পিছনে পেনসিল দিয়া গোটা গোটা করিয়া লিখিতাম, 'রজনী', লিখিয়া রবার দিয়া মুছিতাম, পুনরায়

লিখিতাম, মুছিয়া ফেলিতাম। ওই সময় হেমবাবু বাংলা ক্লাসে একটা ভাব সম্প্রসারণ করিতে দিয়াছিলেন, 'নাহি কিরে সুখ, নাহি কিরে সুখ, এ-ধরা কি শুধু বিষাদময়...'। রাত্রে পড়ার ঘরে বসিয়া হুহু করিয়া বিষাদ-ময় ধরার যাবৎ কথা লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। ষোড়শ বৎসর বয়স্ক কিশোরের পক্ষে ধরণীর বিষাদে এতখানি জ্ঞানার্জ্জন করা বড় কম কথা নয়, বোধকরি হেমবাবুর পক্ষেও তাহা সম্ভব ছিল না। ভাব সম্প্রসারণ লিখিয়া বিষাদের ভারে আমি খানিকটা কাঁদিয়াছিলাম।

দেখিতে দেখিতে এই বিষাদ দূর হইল, বাল্য-বিরহটা তেমন স্থায়ী হইল না। গরম পড়িতেছিল, সকালে স্কুল বসিতে আরম্ভ হইয়াছে। ভোরবেলায় সাইকেলে চাপিয়া স্কুল যাওয়ার সময় মনটা বেশ ঝরঝরে থাকে। শান্ত নির্জ্জন মাঠঘাট, ভোরের সুশীতল বাতাস, আকাশটি সাদা, পথে কোথাও আমের বোলগুলিতে আম ধরিয়াছে, কাঠ-চাঁপা গাছে ফুল ফুটিয়াছে, পথের মধ্যে এই দৃশ্যগুলি দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাওয়ার সময় প্রায়শ রজনীর কথা মনে পড়িত। পর-ক্ষণেই মনে হইত, রজনী এখনও অঘোর ঘুমে। একটা হিংসার ভাব জাগিত হয়ত, ঠিক বুঝিতে পারিতাম না, মনে মনে তাহাকে কুম্ভ-কর্ণের বংশধর বলিয়া শান্তি পাইতাম।

বিকালে রজনীর কথা ভাবার অবসর ছিল না। আমাদের গ্রাম্য-ময়দানে ফুটবল নামিয়া

গিয়াছিল। দুই ঘণ্টা সারা মাঠ চষিয়া গোধূলি-বেলায় যখন বাড়ি ফিরিতাম তখন ঘামে অবসাদে শরীরমন ভরা থাকিত। স্নান করিয়া পড়িতে বসিলে চোখ ভাঙিয়া ঘুম আসিত। ঢুলিতে ঢুলিতে পড়া মুখস্থ করিতাম, মা আসিয়া গা নাড়া দিতেন, বলিতেন, 'ওমা, ঘুমোচ্ছিস যে! চল্ খেতে যাবি।'

গরমের ছুটি পড়িল। চন্দ্রাকে আনানো হইয়াছিল। চন্দ্রার আগমনে বাড়িটা ভরিল। বলিতে কি, চন্দ্রা আসিয়া পড়ায় আমার এক-একা ভাবটা একেবারেই থাকিল না। ভ্রাতাটিকে সঙ্গী করা অসম্ভব বলিয়া তাহাকে বড়দের ব্যাপারে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি, চন্দ্রা আসিলে সঙ্গ জুটিল। আমরা অবসরে লুডো ও ক্যারাম খেলিতাম, আমচুর করিয়া খাইতাম এবং চন্দ্রা তাহার বাক্সের মধ্যে করিয়া যে দু-পাঁচখানি নভেল আনিয়াছিল, তাহা লুকাইয়া লুকাইয়া পাঠ করিতাম।

চন্দ্রাটার শরীরে একটু যেন বাড় ধরিয়াছিল। তাহার কথাবার্তায় চালচলনে মনে হইত সে যেন আমার বড়। চিরটাকাল তাহার চুল ও কান টানিয়াছি, দুই চারিটা কিল পিঠে মারিয়াছি, এখন কান ধরিলে সে যেন কিছুটা ক্ষুব্ধ হইত, চুল ধরিয়া টান মারিলে বলিত, 'উঃ লাগে! এক মুঠো চুল উঠিয়ে দিলি তো?' মাতাঠাকুরানীও চন্দ্রার প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ করিতেন। চন্দ্রা যে এক্ষণে অন্য সংসারের মানুষ সে-বিষয়ে তিনি সতর্ক করিয়া দিতেন।

এই সময় চন্দ্রা একদিন আমার সঙ্গে বিলক্ষণ ভাব জমাইল, দুইটি টাকা বকশিশ করিল, তাহার পর একটা চিঠি দিয়া বলিল, "ডাকঘরে গিয়ে দিয়ে আয়।"

চিঠিটা খামে মোড়া। শরতের ঠিকানা লেখা। বলিলাম, "শরৎকে চিঠি লিখেছিস?" যেন এই চিঠি লেখাটা সমীচীন হয় নাই।

চন্দ্রা বলিল, "তুই দিয়ে আয়।"

"বাবা যদি জানতে পারে?"

"পারুক। কি হয়েছে?"

কি হইয়াছে তাহা আমার জানা ছিল না। কিন্তু অনুমান করিলাম, কৈশোর বিবাহের নিয়মানুসারে সম্ভবত এই পত্রালাপও নিষিদ্ধ।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমার নামে একটা চিঠি আসিয়া হাজির। শরতের চিঠি। শরৎ আমায় দুই-একটি পত্র ইদানীং লিখিতেছিল বটে, কিন্তু তাহা পোস্টকার্ডে। সদ্যোলব্ধ পত্রটি খামে আসিয়াছিল, খামের রঙটাও ফিকা নীল। আমার হাতে চিঠিটা আসার সাথে সাথে যেন অদৃশ্যবার্তায় খবর পাইয়া চন্দ্রাও আসিয়া হাজির। আমায় টানিয়া-হিঁচড়িয়া আড়ালে আনিয়াই হাত পাতিল। "চিঠি দে।"

চিঠিটা আমার. চন্দ্রার তাহাতে কেমন করিয়া অধিকার বর্তায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমায় লিখেছে, আমার চিঠি।"

"তোর নয়, আমার। আমায় দে।"

"বা রে, আমার নামে এল, তোর হবে—!"

"আমারই। আমাদের কথা ছিল তোর নামে

লিখবে। নয়ত বাবা—"

ষড়যন্ত্রটা বুঝিতে পারিয়াও বুঝিলাম না। খামের মুখ ছিঁড়িতেই একটা ভুরভুরে গন্ধঅলা দু তিনটি রঙীন কাগজ হাতে আসিল। শরৎ-ভ্রাতার হস্তাক্ষর। মনোহর ছাঁদে পত্রের গোড়ায় লেখা প্রিয়তমা চন্দ্রা।

ইতিমধ্যে চন্দ্রা আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চিঠির পাতাগুলো কাড়িয়া লইয়াছে। আমার হাতে শুধুমাত্র আবরণটা রহিয়াছে। পত্র হস্তগত করিয়া চন্দ্রা অদৃশ্য হইয়া গেল।

চন্দ্রার কল্যাণে নভেল পড়িতে শুরু করিয়া-ছিলাম, পত্ররহস্য ও সম্বোধন পর্বটা যে আমার বোধবুদ্ধির বাহিরে থাকিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। রোমাঞ্চ লাগিল। বড়ই মিষ্ট মিষ্ট মনে হইল। একটা দীর্ঘশ্বাসও বুকের মধ্যে জমিয়া উঠিল। রজনীকে আমি কি একটা চিঠি লিখিতে পারি না? রজনী কি আমায় একটা চিঠি দিতে পারে না?

শরৎ এবং চন্দ্রা বেশ চতুর। তাহারা যে পত্রালাপটা আমার মারফৎ করিবে এবং পিতা-ঠাকুরের চোখে ধুলা দিবে তাহা পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া কাজে নামিয়াছিল। কিন্তু আমার সহিত রজনীর তো তেমন একটা মতলব স্থির করা নাই। আমি চিঠি লিখিলে রজনীদের বাড়িতে কে কি বলিবে, হাসাহাসি করিবে, অথবা প্রচার করিয়া দিবে, কে জানে! রজনী কি সাহস করিয়া আমায় চিঠি লিখিতে পারিবে? আমার নামে রজনীর চিঠি আসিলে

যদি পিতাঠাকুর জানিতে পারেন? মা'র চোখ হইতেই বা চিঠিটা কেমন করিয়া লুকাইব!

চন্দ্রার সহিত একটা গোপন পরামর্শ করিয়া একটা চিঠি লেখাই স্থির করিলাম। চন্দ্রা যেন তাহার ভ্রাতৃজায়াকে পত্র দিতেছে। কেহই কিছু বলিবে না। চন্দ্রার চিঠির ভিতর আমিও "প্রিয়তমা রজনী" সম্বোধন করিয়া একটা চিঠি দিয়া দিব। শরতের মতন অত কথা লিখিব না, রজনী পড়িবে না, বুঝিতে পারিবে না।

রাত্রে তিনবার খসড়া করিয়া গোটা গোটা অক্ষরে প্রিয়তমা রজনীকে একটা পত্র লিখিলাম। পরদিন যথারীতি চন্দ্রা মারফৎ তাহা খামে ভরতি করা হইল। স্বহস্তে ডাকঘরে ফেলিয়া আসিলাম। বুকের ভিতরটা দুর-দুর করিতেছিল। আনন্দে না ভয়ে, বলা মুশকিল।

পত্রের জবাবের আশায় দুই তিন চার পাঁচদিন অপেক্ষায় অপেক্ষায় কাটিল। ক্রমে সপ্তাহ অতীত হইল। শরৎ ও চন্দ্রার পত্রালাপের বেলায় এত বিলম্ব হয় না। রজনী কি চিঠি পায় নাই? অথবা চিঠিটা পাইয়া সে সকলের কাছে লজ্জায় মরিয়াছে। রজনীর অত লজ্জাটজ্জা নাই বলিয়াই জানিতাম। পক্ষকাল অতীত হইল, জবাব আসিল না। ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া আমার ভয় ভাবনা ও আশংকা হইতেছিল। এমন সময় একদিন রজনীর চিঠি আসিল, স্বতন্ত্র দুটি খাম। একটি খামের মাথায় আমার নাম লেখা। কাঁচা কাঁচা ইংরাজী অক্ষর। নামের

তলায় লেখা ক্লাস নাইন, এম. কে. এইচ. স্কুল। অথচ ঠিকানার বেলায় আমাদের বাড়ির ঠিকানা ও ডাকঘর। এইরূপ নির্বোধ, হাস্যকর ঠিকানা রজনী বই কে আর লিখিতে পারে!

খামের মুখ ছিঁড়িতে একটা রুলটানা-কাগজের পাতা বাহির হইল। তাহাতে সিস পেনসিলে গোটা গোটা করিয়া লেখা: প্রণাম-শতকোটি নিবেদনমিদং, শ্রীচরণেষু, আমি ভাল আছি; তুমি কেমন আছ? তোমার চিঠি দিদি পড়িয়াছে, পিসিমণি পড়িয়াছে। বলিয়াছে, বাঁদর ছেলে। তুমি আমায় অসভ্য কথা লিখিও না। মাগো, লজ্জা করে।

পত্রালাপ পর্বটি স্থায়ী হইল না। শরৎ এবং চন্দ্রা নির্বিঘ্নে তাহাদের বিরহের উপশম করিতেছে, আমি পারিতেছি না—ইহাতে আমাদের অপদার্থতা যতই প্রমাণিত হউক না কেন, একটা ক্ষোভ থাকিয়া গেল। চন্দ্রাদের উপর ঈর্ষাও জাগিল। একবার ভাবিয়াছিলাম, ষড়যন্ত্রটা ফাঁস করিয়া দিই। কিন্তু ভগ্নীটির মুখে মেঘ জমিবে ভাবিয়া তাহাতে রুচি হইল না।

বর্ষা নামিল। আকাশে মেঘ আসে, মেঘ যায়। নবজলধরের সেই ঘনকালো গম্ভীর মূর্তিটির গায়ে যখন দামিনী চমকায়, বৃক্ষ-লতাগুলি আসন্ন বর্ষণের অপেক্ষায় মহানন্দে কাঁপিতে থাকে তখন কোনো কোনো দিন মনটা কেমন বিমর্ষ হইয়া আসা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। তথাপি আমার আর পত্র

লিখিতে সাহস হয় না। স্কুলে ফুটবলের মরশুম চলিতেছে, মনটা সেখানে পড়িয়া থাকে। বিদ্যাচর্চার শেষে খেলার মাঠ হইয়া হাতে পায়ে চোট খাইয়া সাইকেল করিয়া যখন বাড়ি ফিরি তখন বৃষ্টির জলে সর্বাঙ্গ সপসপ করে। রাত্রে এক হাতে চুন-হলুদ গরম করিয়া অঙ্গসেবা করি, অন্যহাতে ইংরাজী বই খুলিয়া 'দি গিফট্ অব গড' পড়ি। ঈশ্বর যে আমায় অনুগ্রহ করিয়া বড়ই বেদনাদায়ক একটি সুখবস্তু দিয়াছেন তাহাও অনুভব করি। সে-সময় হয়ত বিশ্বসংসার ডুবাইয়া মেঘ ডাকিয়া প্রবল বৃষ্টি আসে, ঝিল্লিস্বরে আর ভেকরবে আমার কণ্ঠস্বর কোথায় হারাইয়া যায়। তখন কম্পিত দীপশিখার সম্মুখে বসিয়া, বর্ষণের অবিচ্ছিন্ন শব্দের কুহকে মজিয়া গিয়া রজনীর জন্য কেমন একটা কাতরতা বোধ করিতে থাকি। রজনীর পিত্রালয়ে কি এই বিশ্বজোড়া মেঘটা হইতে বর্ষণ নামে নাই।

রথের পূর্বদিনে রজনী আসিয়া হাজির। চন্দ্রা আমায় পূর্বাহ্নেই শুভসংবাদটা দিয়া রাখিয়াছিল। পিতাঠাকুর মনোহরকাকাকে পাঠাইয়া রজনীকে আনাইয়াছেন। পুত্রবধূকে রথের মেলায় লইয়া যাইবেন।

সন্ধ্যায় রজনীকে দেখিলাম। পড়ার ঘরে চন্দ্রার সহিত গুটিগুটি আসিল। যে মানুষ দু'একদিনের জন্য রথ দেখিতে আসিয়াছে, তাহার সহিত আমার সম্পর্ক কি! গম্ভীর

মুখে বাংলা বই খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম: "মন্দির মধ্যে কে আছে? কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না, অলংকারঝঙ্কার শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া..."

চন্দ্রা আমার পাঠে বাধা দিল। হাসিয়া বলিল, "তোর পড়া রাখ; এই নে, খা—"

তাকাইলাম। সুস্বাদু তপ্ত বেগুনীফুলুরি পাঁপড়ভাজার গন্ধটা নাসাপথকে উত্তেজিত এবং জিহ্বাকে লালাসিক্ত করিতেছিল। চন্দ্রা হাতের পাত্রটা সামনে রাখিল। নারীরত্ন দুইটির হাত মুখ সচল ছিল। রজনীর দিকে একপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরম উপেক্ষাভরে বলিলাম, "আমি খাব না। পড়তে দে, দিক করিস না।"

চন্দ্রা বলিল, "কি পড়ছিস?"

"বাংলা।"

"কাল তো তোর ছুটি। নে, গরম গরম খা—"

বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি পাঠে মনঃসংযোগ করিলাম।

চন্দ্রা এবং রজনীর মধ্যে একটা বোঝাবুঝি হইয়া গেল হয়ত. চন্দ্রা বলিল, "দাঁড়া, আমি আসি, মা চা করছে, নিয়ে আসি।"

চন্দ্রা চলিয়া গেলেও আমি সঙ্কল্পচ্যুত হইলাম না। বার পাঁচেক 'মন্দির মধ্যে কে' 'মন্দির মধ্যে কে' পড়িয়া হঠাৎ থামিয়া গেলাম। রজনী একটা গরম বেগুনি তুলিয়া লইয়া আমার গালে ছেঁকা দিবার উপক্রম করিতেছে।

তাহার হাত ঠেলিয়া দিলাম। রজনী পুনরায় তাহার চুড়ি বালা শাঁখা পরা হাতটি আমার নাকের কাছে আনিয়া চাপিয়া ধরিল।

"ইয়ার্কি মারবে না বলছি।" তাহার হাতটি ঝটকা দিয়া সরাইয়া দিলাম।

রজনী খিলখিল করিয়া হাসিল। "রাগ হয়েছে রে!"

"তুমি কেন এসেছ?"

"ইঃ, বেশ করেছি এসেছি। তোমার বাড়ি? বাবা আমায় এনেছেন।"

"বাবার কাছে যাও। আমায় ডিস্টার্ব করবে না।"

"কত না পড়া হচ্ছে ছেলের! খালি তো মন্দির মন্দির—করছ!"

"আমার খুশি, তোমার কী?"

"আমার কাঁচকলা।..." বলিয়া রজনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল। তাহার পর বলিল, "তোমার পেটভরা রাগ।"

"তুমি আমার কেউ না।"

"বললেই হল!"

"আমি বড় হয়ে আবার বিয়ে করব।"

"আমিও পেত্নী হয়ে তোমার বউয়ের ঘাড় মটকে দেব।"

"তুমি তো পেত্নীই..."

"ভূতের বউ পেত্নীই হয়।"

কথায় রজনী যথেষ্ট সাবালিকা। যুদ্ধটা জমিল না। হারিয়া গেলাম। রজনী আমার মুখে বেগুনিফুলটি গুঁজিয়া দিল। মন্দির

মধ্যে তিলোত্তমা অপেক্ষা করুক, আমার আপাতত তাহাতে আগ্রহ নাই।

পাঁপড় চিবাইতে চিবাইতে রজনী পাকা গৃহিণীর মতন বলিল, "তোমার জন্যে ভেবে মরি। এই বর্ষা, কড়াৎ কড়াৎ বাজ পড়ে, আমার ভয় হয়—ফাঁকা মাঠ দিয়ে স্কুলে যাচ্ছ—কি জানি...। বাজ পড়লে বাজঠাকুরের নাম মনে করবে।"

"বাজঠাকুর কে?"

"জানি না। পিসিমণি বলে বাজঠাকুর।"

"তুমি এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।"

"আমি মিথ্যেবাদী!"

"তুমি আমার কথা ভাব না।"

"কি বলে রে ছেলেটা! ভাবি না বলে—" রজনী যেন তৃতীয় কোনো অদৃশ্য ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখিল, "ভেবে ভেবে ঘুম নেই..."

তাহার 'ঘুম নেই' বলার ধরনটায় হাসিয়া ফেলিলাম। রজনীও হাসিল। সে পুরাপুরি বড় মানুষের, সম্ভবত তাহার মা, পিসি বা দিদির কথা এবং বলার ধরন নকল করিয়াই কথাটা বলিয়াছিল, ফলে হিহি করিয়া না হাসিয়া পারিল না।

পরদিন রজনীরা পিতাঠাকুর ও মনোহর-কাকার সহিত ছয় মাইল দূরে রথ দেখিতে গেল। আমি যাই নাই। রজনীদের ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, সারাদিনের ঝিপঝিপে বৃষ্টিটা তখন প্রবলরূপে দেখা দিয়াছে। বৃষ্টির জলে ও ঝড়ের দাপটে উহারা ভিজিয়া এক-

শেষ, রজনী হিহি করিয়া কাঁপিতেছিল। পড়িতে বসিয়া ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিলাম, রজনীর যেন আজ রাত্রেই জ্বর আসে, জ্বর আসিলে উহাকে আর নাচিতে নাচিতে দুই-একদিনের মধ্যে রানীগঞ্জে ফিরিতে হইবে না।

মাথা মুছিয়া ভিজা জামাকাপড় ছাড়িয়া রজনী এক সময় আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। তাহার ভাবভঙ্গি খুবই স্বাভাবিক, মাথার চুলগুলি যা ভিজা ভিজা দেখাইতেছিল। সে আসিয়া আমার পাশে বসিল। বাহিরে বারিবর্ষণ ক্ষান্ত হয় নাই, গুরুগুরু মেঘ ডাকিতেছে।

রজনী রথের মেলার একটা বিবরণ দিল, নীরবে শুনিয়া গেলাম। বহুবার ওই মেলা আমার দেখা, আগ্রহ অনুভব করার কিছু ছিল না। শেষে রজনী কোন অদৃশ্য স্থান হইতে একটা ফটো বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। বলিল, "মেলায় ছবি তুলেছি; ঠাকুরঝি বলল।"

রথের মেলায় ছবি তোলার দোকান বসিয়াছে জানিতাম না। রজনীর সদ্য তোলা ফটো চটচট করিতেছিল, ছবির সাদা অংশ অপেক্ষা কালোর ভাগটাই বেশী ফুটিয়াছে। বলিলাম, "তোমার কান কই?"

রজনী অবাক। না বুঝিয়া নিজের কানে হাত দিল।

"হ্যাত, এই ছবিতে তোমার কান কই?"

রজনী আমার হাত হইতে ছবিটা টানিয়া

লইয়া পরমাগ্রহে নিজ মূর্তিটা দেখিল। সত্য সত্যই তাহার কান অদৃশ্য হইয়াছে, জায়গাটা কেমন অদ্ভুত দেখাইতেছে। অতিশয় মর্মাহত হইয়া রজনী বলিল, "কি হবে!"

"আমায় দিয়ে দাও।"

"ঠাকুরঝি তো তাই বলেছিল।...না থাক, কানকাটা ছবি রাখতে হবে না। দেখলেই বিচ্ছিরি লাগবে।" বলিয়া রজনী ছবিটা দূরে সরাইল, এবং আক্ষেপের সুরে বলিল, "এই তো চেহারা, তার ওপব কানকাটা তাড়কাকে দেখলে তুমি আমায় তাড়িয়ে দেবে।"

"কানকাটা তাড়কা নয়, শূর্পনখা..."

"জানি গো জানি, আমায় আর শেখাতে হবে না।"

"তুমি তো তাড়কা বললে—।"

"বেশ করেছি বলেছি। ও আমরা বলি।"

রজনীর বিজ্ঞতায় হাসিয়া ফেলিয়া তাহার মাথার খোলা ভিজা চুলের একটি গুচ্ছ ধরিয়া টান মারিলাম। "ছবিটা আমায় দাও, আমি আমি কান দিয়ে নেব।"

"পারবে কি করে?"

"মন্তর দিয়ে!"

মন্ত্রের কথায় এবং আমার মুখ-চোখের হাসি-হাসি ভাব দেখিয়া আমার প্রতি রজনীর ঘোর অবিশ্বাস জন্মিল। রজনী বলিল, "থাক্, আমার ছবি আমিই নিয়ে যাব।"

পরদিন রজনীর জ্বর-জ্বালা আসিল না। দিব্য সুস্থ শরীরে, হাসিমুখে তাহাকে ঘোরা-

ফেরা করিতে দেখিলাম। কি কারণে যেন পিতাঠাকুর তাহাকে সপ্তাহ-খানেক আমাদের বাড়িতে রাখিয়া দিলেন। রজনীর অবস্থান আমার পক্ষে মন্দের ভাল হইল। যদিও আমরা আর একত্রে শয়নকক্ষে সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না, তথাপি দিনের মধ্যে একাধিকবার আমাদের দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হইত। রজনী পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বেশী বাক্‌পটু হইয়াছিল। তাহার দুষ্টামিবুদ্ধিও খানিকটা বাড়িয়াছিল। বিশেষত. চন্দ্রার সাহচর্যে যে সে চতুর হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে আমি সন্দেহ পোষণ করি না।

পুনরায় পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাওয়ার সময় রজনী আমায় তাহার ছবিটা করুণাবশে দান করিল। বলিল, "চেয়েছিলে বড় মুখ করে তাই দিয়ে গেলাম!"

প্রার্থনার বস্তু এইরূপ অকাতরে দান করিতে দেখিয়া আমি দাতাকে কৃতজ্ঞতা-বশে একটি চুম্বন দিলাম। দাতা তাহা গ্রহণ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

৭

বর্ষা ফুরাইল। চন্দ্রাও কবে শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে. তাহার শ্বশ্রূমাতার অসুখ। বাড়িতে আমি একা। আমার ভ্রাতাটি সারাদিন আপনমনে তিন-চাকার সাইকেল চাপিয়া এবং যাবতীয় বালিকাজনোচিত খেলা খেলিয়া দিন

কাটায়; আমার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। দেখিতে দেখিতে শরৎ ঋতুটা প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিল। আমাদের বাড়ির উঠানে শিউলি গাছের ঝোপে সন্ধ্যায় ফুল ফুটিতে শুরু করিয়াছিল, তাহার সুবাসে মনটা আনমনা হইয়া উঠিত। স্কুল যাওয়া ও ফেরার পথে আল-বাঁধা ধানক্ষেতগুলিতে সবুজের সমারোহ দেখিলে চোখ দুইটি জুড়াইয়া যাইত। শরৎ-আলোয় যেন একটি দিগন্তজোড়া প্রসন্নতা নামিয়াছে। আকাশটা দিন দিন নীল ও রৌদ্রময় হইয়া উঠিতেছিল। এবং গ্রামের পুজাবাড়িতে যেদিন প্রথম পুরাতন পাটাতন ও আড়ের উপর নতুন খড় পড়িল সেই দিন হইতেই পুজার গন্ধে মনটা ছন্নছাড়া হইয়া গেল। পুজার সময় রজনী আসিবে। কানাঘুষায় আমি সেইরূপ শুনিয়া ছিলাম।

এতকাল পুজার পূর্বে একমাত্র দুইটি বস্তু কামনা করিতাম পুজার ছুটি এবং মা-দুর্গার আগমন। বলিতে লজ্জা পাই, রজনীর আগমনটাই আমার কাছে এই বৎসরে অন্য সকল প্রত্যাশার মাথার উপর চড়িয়া বসিল। আমার একটি ক্যালেন্ডার ছিল, তাহার তারিখটি আমি প্রতিদিন সকালে উঠিয়া দেখিতাম এবং 'আর আঠাশ', 'আর সাতাশ' বলিয়া সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটির হিসাব মনে মনে টুকিয়া লইতাম।

পুজাও আসিল, মা-দুর্গাও আসিলেন,

কিন্তু রজনী আসিল না। মা-দুর্গা আমার উপর বড় রকমের একটা প্রতিশোধ লইলেন। জানিতে পারিলাম, রজনীর পিতামাতা পূজার দিন কয়টা কন্যাকে কাছে রাখিতে অনুরোধ জানানোয় আমার পিতামহাশয় উদারহৃদয়ে তাহা মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন। তাহার উদারতা আমায় যে সাতিশয় পীড়িত ও ক্ষুব্ধ করিয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে।

নূতন জামা-কাপড়-জুতা দু তরফেই পাওয়া গিয়াছিল, চন্দ্রাও আসিয়া পৌঁছাইল, তথাপি আমার নিকট পূজার আনন্দের বেশীটাই মাটি হইয়া গেল। রজনীর উপর রাগ হইল। সে নিশ্চয় কান্নাকাটি করিয়া পিতৃগৃহে থাকিতে চাহিয়াছে, নয়ত এইরূপ হইবে কেন! যে-স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা অন্যদের এতখানি আপন মনে করে, তাহার মুখদর্শন সম্পর্কেও আমার একটা ভয়ঙ্কর অভিমান হইল।

যথারীতি পূজা শেষ হইল। দ্বাদশীর দিন শরৎ আসিল। দু-চারদিন থাকিয়া সে ফিরিয়া যাইবে। তাহার সম্মুখে 'টেস্ট' পরীক্ষার খাঁড়া। শরৎকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখিলাম না। সে নস্য লওয়া অভ্যাস করিয়াছে, রাত জাগিয়া পড়াশোনা করার সুবিধা হয়। দেখিলাম, তাহার নস্য লওয়ার একটা উদ্দেশ্য ও অলক্ষ্য সংকেত আছে। অতিমাত্রায় হাঁচিলেই চন্দ্রা আসিয়া হাজির হইত।

শরৎ এবং চন্দ্রার অতিরকম ঘনিষ্ঠতা
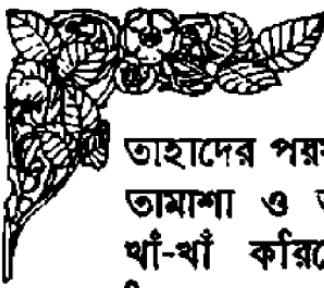
তাহাদের পরস্পরের প্রতি আচার-আচরণে রঙ্গ-তামাশা ও ভালবাসা দেখিয়া আমার হৃদয়টি খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। উহাদের তুলনায় নিজেকে এত দীন ও রিক্ত মনে হইতে লাগিল যে, রজনীকে আমি সর্বতোভাবে বধূ হইবার অযোগ্য মনে করিলাম।

শরৎ বলিল, "তুমি হচ্ছ রামচন্দর; বাবার কথায় বনবাস করছ।...আরে সব নিয়মের বেনিয়ম আছে। বুদ্ধির্যস্য উপায়ং তস্য!"

কথাগুলি নুনের ছিটার মতন লাগিল।

কোজাগরী পূর্ণিমার দিন রজনী আসিল। তাহার পিতাই আত্মীয়ের সহিত বাক্স-পুঁটলি-পাটলা সমেত পাঠাইয়াছেন। শরৎ আমায় টিপ্পনি কাটিয়া বলিল, "তোমার ওয়াইফ, না-না, সিস্টার ওয়াইফ এসেছে।"

কথাটার আমি জবাব দিলাম না।

রজনী আসিয়াই বিজয়ার প্রণামের ঘটা শুরু করিল; যদিও পত্রে একদফা তাহা সারা হইয়াছিল। আমি জানিতাম, একটা প্রণাম পাইবার ন্যায্য অধিকার আমার আছে। মা তাহাকে আমার কাছে পাঠাইবেন। রজনী যাহাতে আমাকে প্রণাম করিবার সুযোগ না পায়, এবং যাহাতে বুঝিতে পারে যে, আমি তাহার তোয়াক্কা করি না, তাহার আসার পথ চাহিয়া কাঙাল হইয়া বসিয়া ছিলাম না,—সেজন্য তাহার এদিকে আসিবার পূর্বেই লুকাইয়া গৃহত্যাগ করিলাম।

গৃহত্যাগ করিয়াও শান্তি নাই; অভিমান

ও ক্ষোভের জ্বালায় হৃদয় বুঝি পুড়িতেছিল। কার্তিক মাসের মনোহর সকালটি আমার চক্ষে শূন্য হইয়া থাকিল। অজস্র কাশফুল কত না ঢেউ তুলিল, ধানক্ষেতের ঈষৎ হরিদ্রাভ শীষ-গুলি বাতাসের দমকায় সি-সি শব্দ তুলিয়া মাঠ হইতে মাঠে বহিয়া গেল, রৌদ্রকণায় দীঘির জলে শালুক পাতাগুলি চিকচিক করিল—আমার দৃষ্টিতে ইহাদের সৌন্দর্য যেন কেমন অসার মনে হইতে লাগিল।

বেলা করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা। মাতাঠাকুরানী নানা আয়োজনে ব্যস্ত, চন্দ্রা এবং রজনীও তাঁহার পিছুপিছু ফিরিতেছে। শরৎ একা-একা ঘরে বসিয়া নভেল পড়িতেছিল। আমাকে দেখিয়া শরৎ হাসিল; বলিল, "কোথায় পালিয়েছিলে? তোমার রজনী কতবার তোমায় খুঁজে গেল। আহা, বেচারীর মুখটা শুকিয়ে গেছে।"

"একজনের কাছে গিয়েছিলাম।"—উদাসীন কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত একটা জবাব দিয়া আমি স্নান করিতে চলিয়া গেলাম।

স্নান করিতে করিতে অবশ্য ভাবিতেছিলাম, শরৎ আমার সহিত রগড় করিল, নাকি রজনী সত্য সত্যই আমার দর্শন-প্রত্যাশায় অনুসন্ধান করিয়াছে।

শরৎ এবং আমি খাইতে বসিলে চন্দ্রা ও রজনীকে দেখা গেল। মা আজ পূজার কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিক পানে আসিতে পারেন নাই। চন্দ্রা গৃহিণীর কাজটুকু পাইয়াছে,

রজনী তাহাকে জল, নুন ইত্যাদি আগাইয়া দিয়া সাহায্য করিতেছে। রজনীর সহিত আমার চোখাচোখি হইল, তাহার দৃষ্টিটায় সংকোচ অথবা অপরাধীর ভাব দেখিতে পাইলাম না। সে আমায় প্রণাম করিতেও আসিল না।

আমরা খাইতে বসিলে শরৎ নানান রকম ফাজলামি করিল. চন্দ্রা তাহাতে নির্লজ্জের মত যোগ দিল, এমন কি, রজনীও বেশ বাছিয়া বাছিয়া কথা বলিতে লাগিল। আমি যথাসাধ্য গম্ভীর রহিলাম, ভাল করিয়া খাইলাম না, যেন আমার রাগটা সর্বক্ষণ প্রকাশ করার চেষ্টায় থাকিলাম।

মধ্যাহ্নে শরৎ নিদ্রা যাইতেছিল। আমি আমার পড়ার ঘরে মাদুর পাতিয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কিসের একটা শিহরণে বার কয়েক নড়িয়া চড়িয়া ওঠার পর ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখি, রজনী তাহার আঁচলের প্রান্ত সরু করিয়া পাকাইয়া আমার কানে-নাকে সুড়সুড়ি দিতেছিল। আমি জাগিয়া উঠিলে সে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

উঠিয়া বসিলাম বটে, তবে কথা বলিলাম না।

রজনী রঙ্গ করিয়া এপাশ ওপাশ ঘাড় ঘুরাইয়া উঁকি মারিয়া আমার মুখ দেখিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "নিজেদের বেলায় আঁটিশুটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি।"

কথাটার অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল না।

তাহার চেষ্টাও করিলাম না; মুখ ফিরাইয়া লইলাম। মাথার দিকের জানালা খোলা ছিল, অনেকটা ছায়া নামিয়াছে, অদূরে নিমগাছতলায় আমার ভ্রাতার দোলনাটি দুলিতেছে।

আমার নীরবতা রজনীর অসহ্য হইল; সে খপ্‌ করিয়া আমার হাতের কাছটায় ধরিয়া ফেলিয়া একটা ঝটকা টান দিল। বলিল, "অত রাগ কিসের!...এই, বোবা কালা! শুনছ, না শুনতেও পাচ্ছ না?"

হাতটা ঝটকা মারিয়া টানিয়া লইলাম। রজনী সামান্যক্ষণ যেন হতচকিতের মতন বসিয়া থাকিল, তাহার পরই সে অদ্ভুত এক কাণ্ড করিল, আমাব গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গা-হাত আঁচড়াইয়া খামচাইয়া, চুল টানিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে আমায় কত কি যে বলিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাগ অভিমান, ক্ষোভ, অপমান —বোধ করি যাবতীয় বোধগুলি মিশিয়া তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। একে-বারেই বালিকা!

রজনীর কথার মধ্য হইতে বুঝিতে পারিলাম পূজার সময় তাহার এখানে আসার প্রবল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহার বাবা-মার ইচ্ছা সে তাহাদের কাছে থাকে। কি করিয়া মা-বাবাকে সে বলিবে, তাহাকে তাহার 'বর'-এর কাছে পাঠাইয়া দাও। লজ্জা করে না মানুষের!

আমার মনের অভিমান ও রাগটা জ্বর ছাড়ার মতন নামিয়া গেল। রজনীর দেওয়া আঁচড়-

কামড়ের জ্বালা সামলাইতে সামলাইতে বলিলাম, "তা বলে তুমি আমার মাথার চুল ছিঁড়ে দেবে? খামচে গায়ের মাংস তুলে ফেলেছ!"

"আমি তোমায় আরও আঁচড়ে দেব। কামড়ে দেব।"

"কুকুর না বেড়াল?"

"কুকুর। নয়ত তখন অমন করলে, তবু কেউ আসে!"

"তোমার জন্যে আমার পুজোটা যে বিচ্ছিরি কেটেছে।"

"ওরে! আর আমার—?"

"তুমি তো মজাতেই ছিলে।"

"মজা বলে মজা!" পরম উদাসীন স্বরে কথাটা বলিয়াই রজনীর কি মনে পড়িল, বলিল, "নিজেদের বাড়িতে নিজেদের মেয়ে কাছে এনে রাখতে পার, আর আমি মা-বাবার কাছে থাকলেই দোষ। ঠাকুরঝি আমায় বলেছে, আসছে বছর আর আসবে না।"

"তুমি?"

রজনী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর মুখ-চোখ গম্ভীর করিয়া আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "সে পরের কথা পরে ভেবে দেখব।"

তাহার পাকামো দেখিয়া আদর করিতে সাধ হইল। রজনীর গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "শাঁকচুন্নী কোথাকার!"

সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমায় অনেকটা রাতে আমরা অভিসার করিয়াছিলাম। দুইজনই সুযোগ-সুবিধা মতন লুকাইয়া বাড়ির পিছনে জ্যোৎস্নালোকে গিয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিয়াছিলাম। আমার ঘরটায় শরতের সহিত দেখা করিতে চন্দ্রা আসিয়াছিল। সময় মতন শরৎ কয়েকবার শিস দিলে আমি ফিরিয়া গিয়া শরতের পাশে শুইয়া পড়িব এবং রজনী চন্দ্রার পাশে। বুদ্ধিটা অবশ্য শরৎ দিয়াছিল।

পূর্ণিমার আলোয় গা বাঁচাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে রজনীর সহিত আমার অনেক গল্প হইয়াছিল। সে-কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কলাগাছের ঝোপের তলায় কোজাগরী পূর্ণিমার আলোতে বেহুঁশ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে রজনী একসময় বলিল, "তোমার জন্যে আমি লুকিয়ে কত কাঁদি, তা জানো!"

"আমিও কাঁদি।"

কথাটা বলিয়া দুইজনা দুইজনার চোখে চোখে তাকাইলাম। কলাপাতার টোপর মাথায় পরিয়া আমরা যেন জ্যোৎস্নার মধ্যে শুভদৃষ্টি সারিতেছি। দুইজনাই হাসিয়া ফেলিলাম। আমার গায়ে গা হেলাইয়া দিয়া রজনী বলিল, "মিথ্যুক কোথাকার!"

৮

দেখিতে দেখিতে দুই-আড়াই বৎসর কাটিয়া

গেল। সময় যে নদীস্রোতের মতন, তাহা যথার্থই। আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমার কিছু কিছু উন্নতি হইয়াছিল, প্রথমত, আমার গোঁফের রেখা ঘন হইয়াছে, আমি এখন ভদ্রসমাজে চলাফেরা করার মতন চুল ছাঁটিতে শুরু করিয়াছি, বেশভূষাতেও একটি চাকচিক্য আসিয়াছে। পিতামহাশয় আমার ইচ্ছাগুলিতে বাধা দেন নাই। বরং আমি যে পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনো করিয়া পরীক্ষা দিয়াছি, তাহাতে তিনি বেশ পরিতৃপ্ত। আমার প্রাইভেট টিউটর ভুবনবাবু পিতামহাশয়কে বলিয়াছেন, পরীক্ষার পাসের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। আমারও ওই বিষয়ে কোনো উদ্বিগ্নতা ছিল না।

আমি বাঁকুড়া কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম; শরৎ সেখানে পড়িতেছে। তাহার কাছে কলেজের গল্প শোনা অবধি মনটা ওদিক পানে ঝুঁকিয়া আছে। পিতামহাশয় যে আমাকে কলেজে পাঠাইবেন, তাহাও আমি শুনিয়াছি। অবশ্য প্রভাতদাদাও আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বর্ধমানে যাওয়ার জন্য লোভ দেখাইয়া পত্র দিয়াছেন। লিখিয়াছেন: "ছোটবাবু, তুমি যদি বর্ধমানে এসে পড়াশুনা কর, তোমার সব ভার আমি নেব। মায় চিনিকেও দু-একমাস এখানে এনে রাখতে পারি। তোমার বিদ্যাচর্চা তাতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে।"...বর্ধমান বাঁকুড়ার ব্যাপারটায় আমার মন দোনামোনা করিলেও জানিতাম এ-বিষয়ে আমার নিজের করিবার

কিছুই নাই; পিতৃদেব যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই হইবে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর অনন্ত সময়। মনের কোথাও কোনো ভার নাই, সবটাই লঘু। কয়েকদিন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাটানো গেল। তাহার পর চন্দ্রাকে আনিতে তাহার শ্বশুরালয়ে গেলাম। পিতামহাশয় পাঠাইলেন।

দেখিতে দেখিতে কত কিছুর পরিবর্তন হইয়া যায়। গত দুই-আড়াই বৎসরে চন্দ্রার এতটা পরিবর্তন হইয়া গেছে, তাহা আমার নিকট এমন প্রত্যক্ষভাবে কখনও ধরা দেয় নাই। বয়স বাড়ার সংগে সংগে চন্দ্রার শরীরে স্বাস্থ্যে কত যে লাবণ্য আসিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। সদ্য বর্ষার পর যেন পাতাটি পুষ্ট হইয়াছে। তাহার চাপল্য হইতে বালিকাজনোচিত ভাবটি মুছিয়া গিয়াছে, চলনে-বলনে কেমন একটা গৌরব ও সানন্দ ভাব ফুটিয়াছে। এখন সে তেমন করিয়া কথাও বলে না, গলার স্বর বুঝি কিছুটা ভারী হইয়াছে, চোখের পাতায় আরও মিষ্টতা নামিয়াছে। চন্দ্রাকে দেখিয়া কেন জানি মনের ভিতরটা মধুর হইয়া উঠিল।

রজনীর কথা আমার বার বার মনে পড়িতেছিল। গত পূজার সময় তাহাকে দেখিয়াছি, তাহার পর আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তখনই আমার দৃষ্টিতে পূর্ণযৌবনা রজনীর বাড়ন্ত রূপটি ধরা পড়িয়াছিল। মাথায় সামান্য দীর্ঘ গড়নে নিটোল হইয়া উঠিয়াছিল, গায়ের রঙটিও

যেন পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ পরিষ্কার বলিয়া মনে হইত। না জানি, এই ছয়-সাত মাসে তাহার কত পরিবর্তন হইয়াছে।

একটা চিঠি লিখিবার সাধ জাগিল। অথচ লিখিতে পারিলাম না।

আমার শ্বশুরমহাশয় কিছুটা ভ্রমণবিলাসী। তীর্থের প্রতি তাঁহার যেমন ঝোঁক তেমন বড় একটা কাহাকেও দেখি নাই। নির্বিবাদে তাঁহারে ডিস্পেন্সারীর ভারটা কম্পাউন্ডারের হাতে ছাড়িয়া দিয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া যাইতেন। মানুষটি সাদাসিধে গোছের, অর্থের চিন্তাও বড় একটা ছিল না। শুনিয়াছিলাম, শ্বশুরমহাশয় স্ত্রী-কন্যাদের লইয়া হরিদ্বারের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছেন। পিতাঠাকুর অবশ্য সঠিক বিষয়টা জানিতেন, কিন্তু তাঁহাকে তো জিজ্ঞাসা করা যায় না।

চন্দ্রা আমার হইয়া সংবাদটি উদ্ধার করিল। শুনিলাম, রজনীরা শীঘ্রই ফিরিবে, ফিরিয়া এখানে আসিবে।

চন্দ্রা বলিল, "তোর এখন পোয়া বারো।"

"কেন?"

"রজনী এবার এসে এখানেই থাকতে পারে।"

"কে বলেছে?"

"মা বলছিল।"

"যা যা, এ বাড়ি তো আর তোর শ্বশুরবাড়ি নয় যে বউ এনে রেখে দেবে।"

"এবারে রাখবে, দেখিস।...তবে রাখলেই বা তোর কি। তুই তো থাকিবি না, রজনী থাকবে—"

বলিয়া চন্দ্রা মুখ টিপিয়া হাসিল। কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেল পাকলেই বা কাকের কী।"

কথাটা অবশ্য সত্য, তথাপি রজনীর আগমন সংবাদে আহ্লাদিত হইয়া বলিলাম, "তুই রজনী রজনী বলছিস যে, বউদি বলতে পারিস না!"

চন্দ্রা মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, "তোর এখন থেকেই এত!"

আমার মনটি অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সশব্দে খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিলাম, "তোরও তো কিছু কম নয়।"

চন্দ্রা সহসা যেন কেমন একটা লজ্জা পাইয়া পালাইয়া গেল।

ফাল্গুন শেষ হইয়া চৈত্রমাস পড়িল। চৈত্রও শেষ হইতে চলিয়াছে। আমার অবসরের দিনগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া, ঘুমাইয়া এবং উপন্যাস গল্প পড়িয়া কাটে। বাড়িতে বাবার ঘরে পুরানো অনেক গ্রন্থাবলী ছিল, বঙ্কিম নবীন হইতে শুরু করিয়া প্রভাতকুমার পর্যন্ত। মাসিক পত্রিকাও আসিত। এ-সকল এতকাল আমার পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু ছিল, এখন আর কেহ কিছু বলে না। ওইসব পড়িতাম, কখনও কখনও আমার স্কুলের বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাহাদের নিকট হইতেও বই আনিতাম। আমার সহপাঠীদের অবস্থাও আমার মতন, খায় ঘুমায় আড্ডা মারে আর নভেল পড়ে।

সংবাদ পাইলাম রজনীরা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার পর হইতেই চাতকের মতন আমি প্রতীক্ষা করিতে শুরু করিলাম।

সেদিন অপরাহ্ন বেলা। আমি বাড়ি ছিলাম না। স্কুলের মাঠে ফুটবল ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিলাম। দিনটা বড় গুমোট ছিল, বিকাল হইতেই কেমন একটা থমথমে ভাব। অপরাহ্ন শেষে কালবৈশাখীর মূর্তিটি আকাশপটে ফুটিয়া উঠিল। দ্রুত বাড়ি ফিরিতেছিলাম। মাঠের মধ্যেই কালবৈশাখী আসিল। আকাশ কালোয় ভরিল, দেখিতে দেখিতে সেই কালিমা যেন কষ্টিপাথরের মতন কঠিন হইয়া গেল। বাতাস দিতে লাগিল। সাইকেল চালানো দায়। প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম। বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখি গাছপালা-মাঠঘাটকে বিপর্যস্ত করিয়া কালবৈশাখী হানা দিয়াছে।

ঝড়টা বহুক্ষণ সদর্পে অনেক কিছু ভাঙাচোরা করিল, বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃষ্টির প্রবলতার সহিত ঝড়ের গর্জন প্রান্তরে প্রান্তরে হুঙ্কার দিয়া ফিরিতেছিল। দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দিকে একটা ঘনান্ধকারময় বর্ষণমুখর রাত্রি নামিল, মনে হইল যেন আমরা কোন নির্জন শূন্য দ্বীপের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

চন্দ্রা আসিয়া বলিল, "তোর একটা খারাপ খবর আছে।"

খারাপ খবর! পরীক্ষা সম্পর্কে নাকি! অসম্ভব। "কি খবর?"

"রজনী আসবে না।"

প্রত্যহের প্রত্যাশা সহসা ভাঙিয়া যাওয়ায় বুকের ভিতরটা শূন্য হইয়া কেমন একটা থমথমে ভাব জাগিল যেন। রজনীর প্রতি ভয়ঙ্কর এক আক্রোশ ও অভিমান জাগিল। বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতেছিল।

চন্দ্রা আমার মুখভাব দেখিয়া সহানুভূতি জানাইল কি না জানি না, বলিল, "তোর একটা সুখবরও আছে।"

চন্দ্রা কি আমার সহিত মজা করিতেছে! বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া কিছু বলিতে যাইতেছি চন্দ্রা আমাকে বাধা দিল। বলিল, "রজনী আসবে না। তার বাবার পা ভেঙেছে, শয্যাশায়ী। তোকে যেতে লিখেছেন। তুই গিয়ে দু-তিন দিন থাকবি।"

আমার শ্বশুরমহাশয় সাত ঘাটের জল খাইয়া তীর্থ করিয়া বেড়াইলেন, তাঁহার পা ভাঙিল না; বাড়ি ফিরিয়া কন্যাটিকে পাঠাইবার সময় পা ভাঙিয়া বসিলেন—ইহা আমার ভাগ্যের দোষ। বোধ করি তখন শ্বশুরমহাশয়ের পা ভাঙা যে আমার হৃদয় ভাঙারই রূপান্তর তাহাও চরম দুঃখের মধ্যে ভাবিয়া থাকিব।

পিতাঠাকুরের আদেশে দুই তিনটি দিনের জন্য শ্বশুরগৃহে আসিলাম। আসিবার সময় মনকে বুঝাইলাম, পরের বিপদে রাগ করিতে নাই। রজনীর আর কি দোষ! দোষ আমার ভাগ্যের। বরং আমি বাঁকুড়ায় চলিয়া যাওয়ার পূর্বে এই যে রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে

চলিয়াছি তাহাও যদি না হইত! বলা বাহুল্য, পরদুঃখে মন বিগলিত হইল, এবং রজনীর সহিত দুই তিনটি দিন থাকিতে পারিব, তাহাতেই মন নাচিয়া উঠিল।

রানীগঞ্জে সেই আসিয়াছিলাম, আর এই। এবারে নলিনীদিদি নাই; তীর্থ সারিয়া আসিয়া তিনি বর্ধমানে চলিয়া গিয়াছেন, রজনী পড়িয়া ছিল, পড়িয়াই থাকিল।

রাত্রে রজনী আসিল। ঘরে টেবিল-বাতি জ্বলিতেছে। দরজা বন্ধ করিয়া রজনী নিকটে আসিল। তাহার মুখ-মণ্ডলে স্নিগ্ধ আনন্দময় একটা হাসি।

"কি মশাই, কেমন আছ?" রজনী বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বামহাতে ঘাড়ের কাপড়টা আরও নামাইয়া দিল। যথারীতি তাহার মুখে পান।

রজনীর পানে তাকাইয়াই আমার মনে হইল, আমার বালিকাবধূটি সদ্য তরুণী হইয়া গিয়াছে। তাহার মাথার খোঁপা, চুলের বোঝা, গলার গড়ন, চোখ-মুখের ভাব, হাত, গা সর্বত্রই একটা নতুনত্বের শ্রী ও লাবণ্য আসিয়াছে। রজনী এতটা সুন্দরী ইহা যেন আগে কোনোদিন বুঝি নাই, দেখি নাই। মুগ্ধনেত্রে অপলকে তাহাকে দেখিতেছিলাম।

রজনী আমার অভিভূত অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৌতুক অনুভব করিল। বলিল, "দেখছ কি? নিজের বউ চিনতে পারছ না?"

"সত্যি...! তুমি কেমন বদলে গেছ!"

"তুমিও গেছ।"

"মেয়েরা কেমন তাড়াতাড়ি বদলে যায়—! চন্দ্রাও কেমন..."

"ঠাকুরঝির যে ছেলে হবে।"

"কে বলল?"

"ঠাকুরঝি আমায় লিখেছে।"

কি জানি কেন, কোথায় যেন মনের বাতাসটি বহিয়া গিয়া একটি রহস্যময় প্রান্তরে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল।

"একটু দাঁড়াও তো।"

"কেন?"

"দেখি না তোমার কাঁধ ছাড়াতে পেরেছি কি না!"

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রজনী আমার সহিত তাহার দীর্ঘতার মাপ করিতে আসিয়া হঠাৎ নীচু হইয়া একটা প্রণাম সারিয়া ফেলিল। বাধা দিবার সুযোগ পাইলাম না। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া সে বলিল, "তীর্থে বেড়াতে গেলে ফিরে এসে প্রণাম করতে হয়; তুমি তো আবার আমার গুরুজন কি না!" বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে তাহার দীর্ঘতার মাপ দেখিল। রজনী আমার কাঁধ ছাড়াইয়া গালে পড়িয়াছে।

আমরা বসিলাম। রজনী বলিল, "তুমি নাকি একবারেই পাস করবে?" বলিয়া সেই পুরাতন দুষ্টামির চোখে আমায় দেখিতে লাগিল।

"ভদ্রলোকের এক কথা।" আমি হাসিলাম।

"তারপর বাঁকড়োয় পড়তে যাবে?"

"বাবা বলেছেন।"

"সেখানে মেয়েরাও পড়ে, বড় বড় মেয়ে। ঠাকুরঝি আমায় বলেছে। তুমি মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারবে না।"

"কি হবে মিশলে?"

"বাঃ!...তা হলে আমি!"

রজনী এমন ভাবে কথাটা বলিল যেন তাহার গতি তাহা হইলে কী হইবে। এত সরলতা ও নির্বুদ্ধিতা যে আমার হৃদয়টাকে কোন আনন্দে রোমাঞ্চিত করিল তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। হাসিয়া বলিলাম, "না, মিশব না।"

"আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছ কিন্তু।"

"করছি।"

রজনী যেন সামান্যক্ষণ তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাইল না। পরে সে আমার বুকে হাত রাখিয়া আঙুল দিয়া 'রজনী' লিখিল, বলিল, "ব্যস, আর কেউ না।" বলিয়া আমার বুকে মাথা রাখিল।

গল্পে গল্পে রাত বাড়িল। আমি এবং রজনী পাশাপাশি শুইয়া, টেবিল-বাতিটা তখনও জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাহিরে বাতাসের দমকা আছে। বৃষ্টি ক্বচিৎকদাচিৎ পড়িতেছিল।

রজনীর কি যেন মনে হইল, বলিল, "আমি এখন ভাল করে শুতে শিখেছি, আর তোমার মুখের দিকে পা দেব না।"

"দিলেই বা কি!"

"কেন?"

"দেহি পদপল্লবমুদারং—"

"সেটা আবার কি? মানে কি?"

অর্থটা বলিয়া দিতেই রজনী আমার পায়ের নিকট হইতে তাহার গা সরাইয়া লইয়া ভর্ৎসনার গলায় বলিল—"আহা!"

৯

চন্দ্রা তামাশা করিয়া যাহা বলিয়াছিল তাহা যথার্থ; বেল পাকিলেও আমার মতন কাকের আনন্দ করিবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। বরং ভাবিয়া দেখিলে আমাকে আরও হতভাগ্য মনে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গান আছে, কোথায় যেন শুনিয়াছিলাম, 'সে কেন দেখা দিল রে, না দেখা ছিল যে ভালো—' ইহার মর্মার্থটি সম্ভবত তখন পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিয়া থাকিব। রজনীর আবির্ভাবটি সত্যই বিজলীর মত হইল, আসিতে না আসিতেই মেঘে লুকাইয়া পড়িল। দুই তিনটি দিন রানিগঞ্জে থাকিয়া ফিরিয়া আসিলাম, এবং প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক শুনিয়া, রাত্রে আকাশের তারা গুনিয়া বৈশাখ মাসটা কাটাইয়া দিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বিরস বদনে বাঁকুড়ায় চলিয়া যাইতে হইল।

শ্বশুরগৃহে যে দুই তিনটি দিন রজনীর সাহচর্য লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল তাহাতে আমার চোখে সমস্ত জগৎটাই অতীব মনোহর হইয়া দেখা দিয়াছিল। আমি একটা নবতর স্বাদ পাইয়াছিলাম।

তরুণী রজনীর প্রকৃতিগত পরিবর্তন যে হইয়াছে তাহাও আমার চোখে পড়িয়াছিল। চন্দ্রার মতন তাহার চাপল্য তেমন সংযত হয় নাই, চলনে বলনে অতটা নিবিড় আনন্দ ও আত্মগত ভাবটিও ওঠে নাই। তথাপি রজনী আর কিশোরীবেলার নির্বোধ বালিকা ছিল না; তাহার স্বভাবে চাপল্যের পরিবর্তে একপ্রকার চটুলতা আসিয়াছিল, কটাক্ষে বিদ্যুৎ জমিতে শুরু করিয়াছিল। চলনে বলনে রজনী যে তাহার বধূত্বের অভিমানটি সজ্ঞানে প্রকাশ করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া হাসিয়া বাঁচি নাই। আসিবার পূর্বে তাহার নিকট স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম, বিবাহ-ব্যাপারের নানা বিষয়ে তাহার পূর্বজ্ঞান যতটা কৌতুককর থাকুক না কেন, বর্তমান জ্ঞান রীতিমত উন্নত হইয়াছে।

নিজের বিষয়ে এইমাত্র বলিতে পারি, কিশোর বয়সের অবোধ ও অর্ধচেতন অনুভবগুলিকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার বোধ আমার হইয়াছিল। সেই বোধ আমায় রজনীর নবরূপে রোমাঞ্চিত ও শিহরিত করিয়াছিল। আমাদের উভয়ের তখনকার অবস্থাটি কেমন ছিল তাহা কাব্য করিয়া বলিলে বলিতে হয়, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে আমি যেন বোধ করি চঞ্চল বাতাসের মতন লঘু ও অস্থির, এবং রজনীও সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় গন্ধামোদে পূর্ণ। কিন্তু বিধাতা আমাদের কপালে বসন্তের প্রমোদ লেখেন নাই; উভয়ের মধ্যে পুনরায়

বিচ্ছেদ ঘটিল। রজনী তাহার পিতৃগৃহে থাকিল, আমি বাঁকুড়ায় চলিয়া আসিলাম।

পিতাঠাকুর স্বয়ং আমায় সাথে করিয়া বাঁকুড়ায় লইয়া আসিলেন এবং কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। শরতের পূর্বব্যবস্থা মতন আমার কলেজ হোস্টেলেই থাকার কথা। হোস্টেলটি পিতার পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু হোস্টেলের ছেলে-ছোকরাগুলির আদবকায়দা তাঁহার মনঃপূত হইল না।

এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। আমার পিতৃদেব তাঁহার জামাতা এবং জামাতা-গৃহের উপর কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাহার কারণ অবশ্য এই যে, শরতদের বাড়িতে তাঁহার 'কৈশোরবিবাহ ও সমাজহিত' গ্রন্থটির নীতি-গুলিকে বড়ই অবহেলা করা হইয়াছিল। সেই নীতি ও নির্দেশ মানিলে শরতের এখনই পিতৃত্বের অধিকার জন্মানোর কথা নয়। আরও দুই-এক বৎসর পরে এই শুভ ঘটনাটি ঘটিলে পিতাঠাকুর নিরঙ্কুশ আনন্দ লাভ করিতেন।

শরতের প্রতি তাঁহার ঈষৎ ক্ষোভের আরও একটি কারণ ছিল। তাঁহার জামাতাটিকে তিনি আদবকায়দা চালচলনে পোশাকে-আশাকে যেরূপে দেখিবার আশা করিতেন, শরৎ মোটেই সেরূপ ছিল না। তাহার সাজপোশাক, চলন-বলন চুল ছাঁটার বহর বড়ই নব্য ছিল; পিতা-ঠাকুর ইহাকে বিলাসিতা ও রমণীকুলের আচরণ বলিয়া গণ্য করিতেন। জামাতার মধ্যে পৌরুষ-ভাবের অভাব তাঁহার পক্ষে বেদনাদায়ক ছিল।

...অবশ্য ইহাও সত্য, শরতের মেধা, চাতুর্য, সপ্রতিভ ভাবটাকে তিনি অন্তরালে প্রশংসাই করিতেন।

মোট কথা, হোস্টেলে আসিয়া পিতাঠাকুর সেখানে যেসব পড়ুয়া ছেলেছোকরাগুলিকে দেখিলেন তাহাদের অধিকাংশের সহিত শরতের পোশাক-আশাক, চুলের বাহার, চালচলন, কাপড় পরার ধরনে কোনো পার্থক্য ছিল না। স্বভাবতই পিতৃদেবের ধারণা হইল, বাঁকুড়ার মতন মফস্বল শহরের যুব-সমাজের মধ্যেও কালের হাওয়া লাগিয়াছে, বিলাসব্যসন ও তারল্য আসিয়াছে। দেশের যুবসম্প্রদায়ের এই অধঃপতনে তিনি কতটা মর্মাহত হইয়াছিলেন তাহা জানি না, তবে বোধ করি, পুত্র ও জামাতার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।

পূর্ব ব্যবস্থা মতন এবং শরতের চেষ্টায় তাহার ঘরে আমার স্থান হইল। পিতাঠাকুর ফিরিয়া গেলেন। ফিরিয়া গিয়া তিনি আমাদের উপদেশপূর্ণ দীর্ঘ এক পত্র দিলেন। সেই পত্রের সার কথাটা এই ছিল যে, সংসারে ভালমন্দ দুই-ই পাশাপাশি অবস্থান করে, বিশেষত একালে মন্দটাই অধিক থাকে; এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মন্দের প্রতি আকর্ষণ ও দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া ভালোর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারে তাহারই চরিত্রবল জন্মায়। চরিত্রবল যাহার নাই সে সংসার ও সমাজের অহিত ভিন্ন হিত সাধন করিতে পারে না।...অর্থাৎ পিতাঠাকুর আমাদের অসৎসংসর্গে না পড়িতে, বিলাসি-

তায় প্রলুব্ধ না হইতে, এবং সর্বপ্রকারে চরিত্র গঠন করিতে বলিয়াছিলেন।

শরৎ চিঠিটা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিরস মুখে বলিল, "শ্বশুরমশাই বড্ড ওল্ড মডেল্‌! ...নাও, ওটা বাঁধিয়ে রেখে দাও, রোজ সকালে একবার করে পড়ে নেবে।" বলিয়া পড়ার টেবিলের এক কোণ হইতে তাহার শখের বাঁশিটা তুলিয়া লইয়া বিছানায় গিয়া বসিল।

বাঁকুড়ায় আসিয়া শরৎ বাঁশি বাজানো অভ্যাস করিতেছিল। তাহার দুর্ভাগ্য, পিতাঠাকুর এই ঘরটিতে আসিলে শরতের পড়ার টেবিলে বাঁশিটা দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর অতি গম্ভীর স্বরে চোখের ইঙ্গিতে বাঁশিটা দেখাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"কে বাজায়?"

শরৎ-ভ্রাতার মুখটি ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক মুখে মাথা চুলকাইয়া সে জবাব দিল, "আজ্ঞে, আমি।"

"কলেজে শেখায়?"

শরৎ কথাটার অর্থ বুঝিল না, বুঝিবার অবস্থা ছিল না। সে নীরব। হঠাৎ তাহার মাথায় বুদ্ধি আসিল। কোনো রকমে আত্ম-রক্ষার জন্য আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, সাউন্ড..., ফিজিক্সে আমরা সাউন্ড পড়ছি।...বাঁশিটা একদিন বাজিয়ে ওই রেসোনেন্স দেখছিলাম।"

পিতাঠাকুর ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে জামাতাকে বুঝাইয়া দিলেন মিথ্যা বলিও না।

শরৎ মুখ লুকাইয়া লইল।...সেই বাঁশিই শরৎ এখন বাজাইতেছে।

পিতার উপদেশপূর্ণ চিঠিটা পড়িয়া রহিল, শরৎ বাঁশি বাজাইতে লাগিল। আমি জানালার বাহিরে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম।

আকাশে মেঘ জমিতেছিল। বর্ষা আসিয়াছে। বাদল-বাতাসের গন্ধে আমার মনটা উদাস হইয়া গৃহপানে ছুটিল। সংবাদ পাইয়াছি, রজনী এতদিনে শ্বশুরগৃহে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে

শরৎ সামান্য সময় বাঁশিতে গানের একটি ভাঙা অস্পষ্ট সুর বাজাইয়া সঙ্গীতচর্চায় বিরত হইল। বলিল, "সিনেমা দেখতে যাবে নাকি?"

আমার মনটা তখন সবে রজনীর বৈকালিক কবরী-বাঁধার দৃশ্যটি দেখিতেছিল, সম্ভবত বৈকালের এই শেষ বেলাটিতে চন্দ্রা ও রজনী পরস্পরের চুল বাঁধিতে বসিয়া জানালা দিয়া আষাঢ় গগনে মেঘসঞ্চার দেখিতে দেখিতে আমাদের কথা ভাবিতেছে।

"কি, যাবে?" শরৎ পুনরায় বলিল।

"কোথায়?"

"সিনেমায়।...কি ভাবছ? রজনীর কথা?"

"আমায় না সেই বই দুটো কিনতে নিয়ে যাবে বলেছিলে?"

"হবে, বই কেনা সিনেমা দেখা—দুই-ই হবে।"

ইতস্তত করিয়া বলিলাম, "রোজ রোজ সিনেমা দেখা—!"

"তুমি একেবারে বাপকা বেটা হচ্ছ—!...চলো।

অত চরিত্র তৈরী করতে হবে না; যা হবার নিজে থেকেই হবে।"

নেশাই বলো আর আকর্ষণই বলো, জমিতে সময় লাগে। প্রথম প্রথম অন্যের দেখাদেখি হয়ত সাধ হয়, ইচ্ছা হয়, আগ্রহ জন্মায়; কিন্তু নূতন নেশার বিপদ, শুরুতে তাহা প্রায়শই ধাতে সয় না, ক্রমে তাহাকে সহাইয়া লইতে হয়; শেষে এই নেশাটা উন্মাদনা জাগাইবার ক্ষমতা লাভ করে।

কলেজে পড়ার আকর্ষণ আমায় যতই আগ্রহান্বিত করুক না কেন, বাঁকুড়ায় আসিয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া থাকিত। জন্মাবধি গৃহে পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে থাকিয়াছি, উহাদের ছাড়িয়া কোথাও যাই নাই, আজ সহসা সেই গৃহপরিবেশটি ছাড়িয়া আসিয়া আমার ভাল লাগিত না। আমার সামান্য একটি বদ অভ্যাস ছিল, হয়ত তাহা দুর্বলতা, স্নানের সময় মাতাঠাকুরানী স্বহস্তে আমার মাথার চুলে তেল মাখাইয়া দিতেন। অতি বাল্যকাল হইতে, স্বাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও, এই বিশেষ অভ্যাসটি আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই, মাতাঠাকুরানীও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। হোস্টেলে আসিয়া স্নানের বেলা শরতের কথা মতন সুগন্ধি তেল মাখিবার সময়, কেন জানি না, গলার কাছটায় বাতাস জমিয়া কঠিন হইয়া আসিত। শরৎ আমার মুখ দেখিয়া কিছু অনুমান করে এই ভয়ে স্নানঘরের দিকে ছুটিয়া পালাই-

তাম।...পিতাঠাকুরের জন্য, ভ্রাতাটির জন্য, এমন কি চন্দ্রার—যাহার অদর্শন এখন খানিকটা অভ্যাস হওয়ার কথা—জন্যও মন খারাপ হইত। রজনীর বিরহে হা-হুতাশের তো অন্ত ছিল না।

আমার গৃহের শান্ত, কোলাহলহীন পরিবেশের সহিত এই ছাত্রাবাসটির কোথাও কোনো মিল ছিল না। আমাদের সেই গ্রাম্য, অতি পরিচিত স্নিগ্ধ প্রকৃতির সহিত আমার আজন্মকালের সম্পর্কটা ঘুচিয়া যাওয়ায় মনটা যেন মরিয়া থাকিত। আমি নিতান্ত গ্রাম্য বালক, লোহা কারখানার যে স্কুলে বরাবর বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি তাহার কোনো চাকচিক্য ছিল না, খানিকটা পাকা বাড়ি, বাকিটা খড়ের ছাউনি করা কাঁচা ইমারত; মাস্টারমহাশয়রাও নিতান্ত সাধারণ সমাজের মানুষ ছিলেন। স্কুলের ঘরবাড়ি মাস্টারমহাশয় এবং বন্ধুদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্কটা বড় গভীর ছিল; বাঁকুড়ার কলেজে পড়িতে আসিয়া তাহার লেশমাত্র স্পর্শ পাইতাম না। মিশনারী অর্থে কলেজটা রীতিমত জমক করিয়াই করা হইয়াছিল, তাহার প্রকাণ্ড ইমারত, মস্ত মস্ত গৃহ, আদবকায়দা, গাম্ভীর্য; কিন্তু আমার মতন নবাগতকে ইহা কেবলমাত্র বিমূঢ় করিত।

কলেজে পড়ার আগ্রহটা তাই আমার কাছে গোড়ায় নাবালকের শখের নেশার মতন হইল। অনভ্যাসের দরুন পদে পদে বিব্রত ও শ্বাসবন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

দেখিতে দেখিতে এই নেশা জমিয়া উঠিল। যাহার মধ্যে প্রথমটায় কোনো আনন্দ পাই নাই, তাহাই প্রভূত আনন্দের উপাদান হইল।

কলেজের পড়াশোনা পুরাদমে শুরু হইয়া গিয়াছিল, সহপাঠীদের সহিত আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতেছিল. হোস্টেলের জীবনযাত্রার সহিত অভ্যাসের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গেল। আমার গৃহ-পীড়া অনেকটা অন্তর্হিত হইল। কলেজ-জীবনের রোমাঞ্চ ও উন্মাদনা, স্বাধীনতা ও সুখের আস্বাদটা পাইতে লাগিলাম।

স্বীকার করিতে দোষ নাই, শরৎ আমার বাহ্য স্বভাব হইতে স্কুলের এবং গ্রাম্যতার হীনতা বোধটা কাটাইয়া তুলিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। আমার ধুতি পরার বহর, কেশ-চর্চা, জামার কাটছাঁট হইতে একটি কলোনীর যুবককে আবিষ্কার করা সম্ভব হইতে লাগিল। কথাবার্তাও সপ্রতিভ হইয়াছিল।

একটি বিষয়ে শরৎ আমায় সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, "কতকগুলো মহা বখা ছেলে আছে. আমি বলি 'আউট সিগন্যাল', তাদের পাল্লায় পড়ো না।"

শরৎ আমায় সেই বখাটে ছেলেগুলির তালিকা ও পরিচয় জানাইয়া বলিল, "ওরা সব ডন জুয়ান, মেয়ে দেখলেই জিব দিয়ে জল ফেলে, সাবধান।"

শরৎ আত্মীয় বন্ধুর দায়িত্ব পালন করিয়াছিল, না করিলেও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমার সহিত সেই বিপজ্জনক ছেলেগুলির কোনো

সম্ভব ঘটে নাই। এ-সম্পর্কে বরাবরই একটা ভীতি আমার ছিল। ইতরতা জিনিসটা সহ্য করিতে পারিতাম না। ইহারা অশালীন, অসভ্য ও ইতর প্রকৃতির ছিল।

রজনী আশংকা প্রকাশ করিয়াছিল, কলেজে বড় বড় মেয়েরা পড়ে, তাহাদের সহিত মেলা-মেশা করিলে আমার মতিভ্রম ঘটিতে পারে। মিথ্যা বলিব না, রজনীর নিকট একটি পত্রে আমি এ-বিষয়ে আমার সরল স্বীকারোক্তিটি করিয়াছিলাম, লিখিয়াছিলাম: তাহার চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা আমি করি না, তাহার মুখ ভিন্ন অন্য মুখে আমার রুচি নাই।

কথাটা যে কত সত্য ঈশ্বরই জানিতেন। বলিতে বাধা নাই, আমাদের ক্লাসে ছাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল। তাহারা ক্লাসের শুরুতে প্রফেসারের পিছন পিছন দল বাঁধিয়া আসিত, পড়া শেষ হইলেই চলিয়া যাইত। ক্লাসের ফাজিল ছেলেগুলি বলিত, যাত্রার 'সখীর দল'। উহাদের লইয়া দু পাঁচটা ঠাট্টা তামাশা রসিকতা যে না হইত তাহা নহে, তবে আমাদের মধ্যে আপত্তিজনক কথাবার্তা কেহ বলিত না। প্রণয় কান্ডও ঘটে নাই। সে সুযোগও ছিল না। আফসোসের কথা, তেমন সুন্দরী ও সুশ্রী সহপাঠিনী কেহ ছিল না, উপরন্তু সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়েগুলি তাহাদের স্বাভাবিক সংকোচ, জড়তা ও সংস্কারবশে নিজেদের এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করিত। বলা বাহুল্য, রজনীকে

আমি এক বর্ণও মিথ্যা লিখি নাই, রজনীর মুখ ভুলিয়া অন্য মুখের চিন্তা করার সংগত কোনো কারণ ছিল না।

শরৎ অবশ্য বলিত, রজনীর নাম জপ করিতে করিতে আমার সবটাই রজনীময় হইয়া গিয়াছে। সে আমার নামে একটা ছড়া রচনা করিয়াও রজনীকে পাঠাইয়াছিল। তাহার কাব্যচর্চার না হোক, রসিকতার প্রমাণ তাহাতে ছিল। সেই চরণ দুটি আজও আমার মনে আছে; শরৎ-ভায়া লিখিয়াছিল:

দিনমান দহে প্রাণ, কহি তোমা, সজনী;
কখন ফুরাবে বেলা দেখা দিবে রজনী।

রজনীও একটা পালটা জবাব দিতে পিছ-পা হয় নাই দিব্য ছন্দ গাঁথিয়া লিখিয়াছিল:

রজনী আসিলে আসে সুগভীর তন্দ্রা;
ননদাই পায় ভাই ননদিনী চন্দ্রা।

ফাজিল শরৎ স্বীকার করিয়াছিল, জবাবটা মন্দ হয় নাই।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, রজনী ও চন্দ্রার সহিত আমাদের পত্রালাপের একটি কৌশল ছিল। সহজ পথে আমাদের স্ব-স্ব স্ত্রীর সহিত পত্রের আদান-প্রদান বাঞ্ছনীয় ছিল না; পিতা-ঠাকুর তাহা পছন্দ ও বরদাস্ত করিবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। মৌখিক নিষেধ কিছু ছিল না বটে, তবে তাঁহার 'কৈশোরবিবাহ ও সমাজহিত' গ্রন্থে যে সকল আইনবিধির উল্লেখ ছিল তাহাতে দাম্পত্য জীবন যাপনের যোগ্য বয়স ও

জ্ঞানবুদ্ধি না জন্মানো পর্যন্ত 'প্রণয়পত্র' লেখার বিষয়টা নিষিদ্ধ ছিল। শরৎটা নিজেদোষে মজিয়া সকলকেই মজাইয়াছিল। হুট্ করিয়া সে সন্তানের ভাবী পিতা হইতে বসিয়া একটা গুরুতর আইন যে অমান্য করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; পুনরায় আমরা যদি আরও একটা অন্যায় করি তাহার ক্ষমা হইবে বলিয়া মনে হইত না। আমার পিতৃদেবের দৃষ্টিতে আমরা যে এখনও দাম্পত্য জীবন যাপনের যোগ্য হই নাই! অগত্যা একটা কৌশল করিতে হইয়াছিল।

বাঁকুড়ায় আসিবার পূর্বে শরৎ বাড়িতে যে পত্রগুলি আমায় দিত তাহা কদাচিৎ আমার পত্র বলিয়া দাবি করা যায়। আমার নাম-লেখা সেই খামের চিঠিগুলি প্রকৃতই চন্দ্রার পত্র। বাঁকুড়ায় আসিবার পূর্বে পূর্বোক্ত উদাহরণ-মতে আমি চন্দ্রার সহিত একটা ষড়যন্ত্র সারিয়া আসিয়াছিলাম। রজনী আসিলে চন্দ্রা তাহাকে সে বিষয়ে অবহিত করিবে ইহা স্থির ছিল। সেই ষড়যন্ত্র অনুযায়ী বাঁকুড়া হইতে প্রেরিত সকল পত্রে আমি চন্দ্রার নাম ঠিকানা লিখিতাম। (অবশ্য পিতৃদেবকে লেখা পত্রের কথা স্বতন্ত্র)। স্বভাবতই আপাতদৃষ্টিতে পত্রগুলি প্রিয় ভগ্নীর নিকট লিখিত ভ্রাতার পত্র বলিয়াই মনে হইত। প্রকৃত অর্থে উহা কখনও রজনীকে লেখা আমার পত্র, কখনও চন্দ্রাকে লেখা শরতের পত্র। কোন পত্রটি কাহার তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা একটা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার

করিতাম। খামের উল্টাপিঠে একপাশে অতি সাবধানে, সকলপ্রকার সন্দেহ বাঁচাইয়া একটা টেরা ক্রস চিহ্ন দিলে তাহা 'রজনী'র পত্র হইত; অন্যথায় পত্রটি চন্দ্রার। পালটা ব্যবস্থা-টিও সেইরূপ ছিল, বাঁকুড়ার সকল পত্র আমার নামে আসিত, প্রেরক হইত চন্দ্রা। দুই প্রান্তে দুই জোড়া তরুণ দম্পতির পক্ষে একটি মাত্র আদান-প্রদান ব্যবস্থা খোলা থাকায়, কিছু কিছু অসুবিধা ছিল বই কি! পত্র লেখার ইচ্ছাটা তো হিসাব মানিয়া চলার কথা নয়, অথচ বর্ষার প্রকোপে, নবকদম্বের ঘ্রাণে অথবা রাত্রে-দেখা কোনো মধুর স্বপ্নের রেশ টানিয়া যখনই রজনীকে একটা চিঠি লিখিতে সাধ জাগিয়াছে, দেখিয়াছি সেবারের চিঠির পালাটা শরতের; তাহার লেখার দান আমায় দিবে এতবড় উদারতা তাহার নাই। বলা বাহুল্য, আমারও ছিল না।

চন্দ্রাটা কয়েকবারই বড় গণ্ডগোল করিয়াছে, সাঙ্কেতিক চিহ্ন যথাযথ ব্যবহার করিতে ভুল করিয়া আমায় লজ্জায় ফেলিয়াছে। রজনীর চিঠি ভাবিয়া খাম খুলিয়া দেখিয়াছি, শরৎকে লেখা চন্দ্রার পত্র। দু-পাঁচটি শব্দ চোখে পড়িয়া গিয়াছে, মরমে মরিয়া গিয়াছি। কি করিয়া এত অন্যমনস্ক ভাবী জননীটি তাহার সন্তান পালন করিবে তাহা ভাবিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইতাম।

পুজার ছুটি আসিয়া গিয়াছিল। বর্ষার পালা ফুরানোর খেলা চলিতেছিল। আকাশটি

যেন সদ্য ধৌত, সিক্ত, কিন্তু তাহাতে নীল তখনও জমে নাই, রৌদ্রের মাত্রাটিও ধরে নাই। শারদীয় বাতাসে পূজার গন্ধটি যতই জমিয়া ওঠে, আমার গৃহ-পীড়া ততই বৃদ্ধি পায়। এমন সময় একদিন পত্র আসিল, চন্দ্রার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে; সংবাদদাতা অবশ্য রজনী।

এতবড় একটা শুভ সংবাদ শরৎকে প্রথমটায় একেবারে বিমূঢ়, বোকা ও নির্বাক করিয়া রাখিল। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধাক্কাটা কাটিতে সে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল, মহানন্দে একটা লাফ মারিল। তাহার বিছানা, আমার বিছানা লণ্ডভণ্ড করিয়া ছেলেমানুষের মত কয়েকটা ডিগবাজী খাইল, মাথার বালিশ ছুঁড়িয়া ফেলিল, হো হো করিয়া হাসে আর চেঁচায়। অবশেষে তাহার কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া হাত শূন্যে তুলিয়া বলিল, "নাউ, আই অ্যাম এ ফাদার..."

সারাটা রাত শরৎ যাহা করিয়াছিল তাহা আর না বলিলাম। এই রকম একটি নাবালক পিতার কাণ্ডকারখানা আমার সাবালক পিতাঠাকুর যদি দেখিবার সুযোগ পাইতেন, হয়ত তিনি পিতৃত্বের পদমর্যাদার এমন চাপল্য মার্জনা করিতে পারিতেন না। মোট কথা, শরৎ পিতা হইয়াছে এই চিন্তায় বিস্মিত, আনন্দিত যতটা হইয়াছিল ততটাই যেন নিজের সম্পর্কে নিজেরই একটা কৌতুক অনুভব করিতেছিল।

শরৎ-ভায়া একসময় খানিকটা কাঁদিয়াছিল।

কেন, জানি না। আনন্দে না কি কোনো অপ্রকাশ্য আবেগে তাহা বুঝিতে পারি নাই।

১০

পূজার সময় বাড়ি আসিলাম। শরৎ আমার সহিত আসে নাই। পূজার কয়েকটা দিন পরে লক্ষ্মীপূজার সময় সে আমাদের নিকট আসিবে পূর্ব হইতেই স্থির ছিল।

নিজগৃহে ফিরিয়া নূতন করিয়া দেখার বস্তুর অভাব ছিল না। চন্দ্রার পুত্র, স্বয়ং চন্দ্রা, রজনী—সবই দর্শনীয়। চন্দ্রার পুত্র-সন্তানটিকে দেখিয়া আমি হাসিয়া মরিলাম। কয়েকটা পুরাতন স্মৃতি মনে পড়িল। একদা বালিকা বয়সে চন্দ্রা তাহার মাথা-ফাটা একটি পুতুলকে তেল মাখাইয়া শীতের রোদে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, আমি কোথা হইতে খানিকটা জল আনিয়া পুতুলটাকে স্নান করাইয়া দিবার সময় তাহার মাথাটি গলিয়া কাদা হইয়া গেল। পা ছড়াইয়া বসিয়া তারস্বরে চন্দ্রা সেদিন যেভাবে ক্রন্দন করিয়াছিল তাহা শোকাহত যে কোনো জননীর পক্ষেও সহ্য করা মুশকিল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগ্নীটিকে দুর্বাসার মতন অভিশাপ দিয়াছিলাম, তাহার সন্তান হইলে তাহার দুইটা করিয়া মাথা হইবে। কেন যে এইরূপ অদ্ভুত অভিশাপ দিয়াছিলাম জানি না; সম্ভবত আমার ধারণা হইয়াছিল—দুইটা মাথা থাকিলে একটি যদিও বা ফাটে অপরটি

ফাটিবে না, এবং জলে পড়িলে গলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকিবে না। অভিশাপটার কথা মনে পড়িয়া গেলে বিলক্ষণ হাসিলাম। তাহার পুত্রটি আমার যথেষ্ট কৌতুক সঞ্চার করিয়াছিল। শরতের মত গায়ের রঙ, মুখের আদলটিও যেন প্রায়-শরৎ, তবে ক্রন্দনের স্বভাবটি চন্দ্রার মতই পাইয়াছিল।...বড়ই আশ্চর্যের কথা, চন্দ্রাকে আমি এমন এক কমনীয়, স্নেহময়ী মূর্তিতে দেখিলাম যে, মনে হইল তাহার সমস্ত মনটাই যেন সন্তানের দিকে পড়িয়া আছে। সন্তান পালনে তাহাকে যতটা অপটু মনে করিয়াছিলাম, তাহাও সত্য নয়। রজনীও দিব্য ওই কাঁচা শিশুটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, কোলে তুলিয়া দুলাইতেছে। শিশুটার গালে আলগা ঠোনা মারিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া, ছড়া কাটিয়া সে যেরূপ আদর প্রদর্শন করিতেছিল, তাহাতে আমি আতঙ্কিত হইলাম। রজনী বিশেষ সাবধানী নয়। হাসিয়া চন্দ্রাকে বলিলাম "যাকে-তাকে অত ঘাঁটিতে দিস না—ছেলের হাত পা ভেঙে রেখে দেবে।"

রজনী নিকটেই ছিল, কথাটা কানে যাইতেই মুখ ফিরাইয়া ভ্রূকুঞ্চন সহকারে এমন একটা ভঙ্গি করিল যাহার অর্থ: ও, তাই নাকি?

চন্দ্রা সকৌতুক টিপ্পনী কাটিল, "তোমার বউ এখনও কাঁচা খুকীটি রয়েছে নাকি!"

আমার বধূটি যে কোনো অংশেই আর নাবালিকা নয় চন্দ্রার পক্ষে তাহা স্মরণ করানো বাহুল্যমাত্র ছিল। বরং কয়মাস পূর্বেও তাহাকে

স্বল্পসময়ের জন্য যেরূপ দেখিয়াছি তাহারও কিছু প্রকৃতিভেদ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। প্রকৃতপক্ষে বিবাহের পর যে অল্প কয়েকবার সে আমাদের গৃহে আসিয়াছে, এবং বলা চলে —রাত পোহাইতেই পালাইয়া গিয়াছে—তাহাতে তাহার আসা-যাওয়া যেন নিতান্ত একটা শখের ভ্রমণ ছিল। উহাকে বাস্তবিক এ-গৃহের অতিথির মত মনে হইত। অতিথির মতনই তাহার সমাদর হইত; রজনীও ক্ষণিকের সুখ-আনন্দ দিয়া চলিয়া যাইত। এখন সে আর অতিথি নয়, গৃহের মানুষ। এই সংসারের সহিত তাহাকে নিজের সম্বন্ধটি স্থাপন করিতে হইতেছে। স্বভাবতই রজনীর হাবেভাবে, কাজকর্মে তহার অধিকারটি বেশ স্পষ্ট করিয়াই প্রকাশ পাইতেছিল। অবশ্য, সংসারের নানা কাজে তাহার হাতের স্পর্শ যতটা, গলার সাড়া তদপেক্ষা বেশী হইলেও হইতে পারে। শরৎ আমায় বলিয়াছিল, কোন সংস্কৃত কাব্যে নাকি বলা আছে, ময়ূরের পেখম আর রমণীর কণ্ঠস্বর—ইহাই তাহাদের ভূষণ।

রাত্রের ট্রেনে বাঁকুড়া হইতে আদ্রা-আসানসোল হইয়া বাড়ি আসিয়াছিলাম। সর্বাঙ্গে অনেক ধূলাবালি কয়লার গুঁড়া জমিয়াছিল। স্নান সারিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে শেষ-আশ্বিনের বেলা হঠাৎ কেমন নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। রৌদ্রের মলিনতা দেখিয়া আকাশ-পানে চাহিলাম, মেঘ জমিতেছে। বাতাস প্রবল

ছিল, জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি, ধানের ক্ষেতে যেন সবুজ-জলের একটা ঢেউ দুলিয়া দুলিয়া দিগন্তের দিকে চলিয়া যায়, সেই ঢেউয়ের মাথায় কখনও মেঘচ্ছায়া পড়ে, কখনও রৌদ্র। বাতাসের সি-সি শব্দটা থামে না, কাশের বনে কাশফুলের সাদা ঝালরটি দুলিতেই থাকে, কখনও দোয়েল পাখির ডাক কানে আসে। আমার সহিত ইহাদের সম্পর্কটা জানালায় দাঁড়াইয়া অনুভব করিতেই বাল্যের স্মৃতিগুলি আমার চোখে তন্দ্রার মতন জড়াইয়া আসিল।

বিছানায় শুইয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না; সারারাতের অনিদ্রা এই অলস মধ্যাহ্নে তাহার পাওনাটুকু মিটাইয়া লইয়া যখন প্রস্থান করিল, চোখ মেলিয়া দেখি, ঘরের মধ্যে আঁধার জমিয়াছে। জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৈকালের আলোকহীনতার সহিত মেঘময় বাদল আবহাওয়াটা চোখে পড়িল। খেপা আশ্বিনের এই মুখভার হয়ত আজ আর কাটিবে না।

বৃষ্টি আসি-আসি করিয়াও আসে না। আমার সাইকেলটাকে ঝাড়িয়া মুছিয়া বাহিরে আনিলাম, বন্ধুদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাইব। মাতাঠাকুরানী অবশ্য নিষেধ করিয়াছিলেন, বৃষ্টি আসিলে ভিজিব, তাঁহার নিষেধ শোনা অপেক্ষা বন্ধুদের সহিত মিলনটাই আমার কাম্য ছিল। কলেজ হইতে যত গল্প আনিয়াছি, যত রোমাঞ্চ, আনন্দ তাহা যতক্ষণ না তাহাদের মধ্যে বিলাইতে পারিতেছি ততক্ষণ

স্বস্তি পাইতেছি না। বন্ধুদের মধ্যেও দু'চার জন, কেহ হেতমপুর, কেহ বর্ধমান কলেজে পড়িতে গিয়াছিল। তাহাদের গল্পও শোনা চাই।

সাইকেল লইয়া দালান দিয়া যাইতেছি, রজনীর সহিত মুখোমুখি হইলাম। আমায় দেখিয়া সে দাঁড়াইল, চারিপাশে চকিতে চাহিয়া দেখিল, পরে কাঁধের কাছে কেমন একটা হিল্লোল তুলিয়া মৃদু গলায় বলিল, "আহা, কী কাপড় পরার ছিরি! লটপটে বাবু। যাও, কাপড়টা ছ'ড়ে আন।"

রজনীর এই তিরস্কার ও শাসনের কাঁচা-পাকা ভঙ্গিটি এতই চমৎকার লাগিল যে হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "পুরোনো কাপড় ..., শ্বশুরবাড়ির।"

আমার সপ্রতিভ জবাবে রজনী বুঝি সবিস্ময়ে আমায় লক্ষ করিতেছিল, তাহার দিকে সকৌতুক কটাক্ষপাত করিয়া সাইকেলের ঘণ্টিটা টিপিয়া দিলাম। রজনী সশঙ্ক নয়নে চারিপাশ দেখিল. তাহার পর আমাকে তাহার সেই অতি পুরাতন উপায়ে জিভ ভেঙাইয়া চকিতে পলায়ন করিল।

ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর আকাশের মেঘ ছিঁড়িয়া গিয়াছে, বাতাস অতীব চঞ্চল। তরুলতা, ঘাস, মাঠ সবই ভিজিয়াছে, হাওয়ায় জলকণার আর্দ্রতা।

পঞ্চমীতিথি, গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপে মাঝে মাঝে ঢাক বাজিয়া উঠিতেছে। সারাটা পথ গলা ছাড়িয়া শরতের শেখানো একটা গান গাহিতে গাহিতে আসিয়াছি। আমার সেই তন্ময়চিত্ত গানের কিছুটা পলাতক বাতাস কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহা জানি না, তবে বাকী অংশটা আমার মনটিকে বেশ আপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছিল। বাড়ি পৌঁছাইয়া শিউলি-তলার কাছে দাঁড়াইয়াও গানের রেশটি থামাইতে পারি নাই। হঠাৎ খেয়াল হইল, বাড়ি আসিয়াছি। সহসা গান বন্ধ হইল। বাহির বাড়িতে পিতাঠাকুরের বসার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। আমার সঙ্গীতচর্চা তাঁহার কানে গিয়াছে কিনা বুঝিতে পারিলাম না। কিঞ্চিৎ আতঙ্কিত হইলাম। তথাপি গায়ে মাথায় কয়েক বিন্দু জলকণা, পায়ে সামান্য কাদামাটি, শরৎ-সন্ধ্যার আর্দ্র বাতাস, শিউলিফুলের সুমধুর ঘ্রাণ আমায় বহুকাল পরে যেন নিজের জগতে ফিরাইয়া আনিল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া একখণ্ড বঙ্কিম গ্রন্থা-বলী পড়িতেছিলাম। বেশ কয়েক পাতা পড়া হইয়া গেল, আমার প্রত্যাশিত পদশব্দটি এখনও আসিল না। মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাই, কান পাতি—যাহাকে কামনা করি তাহার পদধ্বনির আভাসও শ্রুতিগোচর হয় না। জানালার দিকে তাকাইলে মনে হয় রাত্রি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

অবশেষে রজনী আসিল। তাহার পদশব্দ শুনিয়া অতি মনোযোগী ছাত্রের মতন বিছানায় উপুড় হইয়া গ্রন্থাবলী পড়িতে লাগিলাম।

রজনী আসিল। আমি মুখ তুলিলাম না, না তুলিয়াও স্পষ্ট বুঝিলাম সে দরজা বন্ধ করিল।

রজনী বিছানার কাছে আমার মাথার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও আমি একটা পাতা উল্টাইয়া পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিলাম।

রজনী দুই মুহূর্ত দাঁড়াইয়া বোধ করি কোনো মতলব ঠাহর করিল, হঠাৎ দেখি টেবল-ল্যাম্পের বাতিটা আস্তে আস্তে মলিন হইতে মলিনতর হইয়া আসিতেছে। মুখ তুলিলাম। রজনীর একটি হাত আলোর সলিতা ওঠানোর কলের উপর, সে সলিতাটা ক্রমশই নামাইয়া দিতেছে।

"ও! তুমি!" আমি যেন এতক্ষণ কিছুই দেখি নাই, বুঝি নাই।

রজনী তাহার মাথাটা একপাশে অনেকখানি হেলাইয়া রঙ্গ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে মশাই, আমি—।"

রজনীর সেই ভঙ্গিটা এবং কথা বলার ঢঙটা না দেখিলে তাহার চমৎকারিত্ব বোঝানো যায় না। তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিলাম, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িল। বলিলাম, "আলোটা একটু বাড়াও।"

"কেন?"

"বাড়াও না। একটা মজার জিনিস দেখাব।"

রজনী বাতির শিখা বাড়াইয়া দিল।

"এখানে বসো।"

"কি?"

"হ্যাত্, বসো না..."

রজনী আমার মাথার পাশে বিছানার কিনারায় বসিল। তাহার দিকে বইটা আগাইয়া দিলাম। বলিলাম, "এখানটায় পড়ো।"

"কি পড়ব!...কি বই ওটা!"

"ইন্দিরা।...এখানটায় পড়ো। জোরে জোরে।"

"ইস্...মাস্টারী...!" রজনী আমার পাশে ঝুঁকিল, তাহাকে আঙুল দিয়া 'ষোড়শ পরিচ্ছেদের' মাথাটা দেখাইয়া দিলাম।

রজনী মুখ নীচু করিয়া মনে মনে পড়িল। অপেক্ষা করিয়া আমি তাহাকে একটা তাগাদা দিলাম, অবশ্য হাসি চাপিয়া। "জোরে জোরে পড়ো।"

আমার দিকে বইটা ঠেলিয়া দিয়া রজনী মুখ তুলিল। "আহা রে, আমি যেন ওই। আমার বয়ে গেছে তোমায় জ্বালাতন করতে। তুমি পড় গে যাও।"

বইটা টানিয়া লইয়া আমি সরবে পড়িতে লাগিলাম: "পুরুষকে দগ্ধ করিবার যে কোনো উপায় বিধাতা স্ত্রীলোককে দিয়াছেন, সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া আমি অন্টাহ স্বামীকে জ্বালাতন করিলাম। আমি স্ত্রীলোক —কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিব। আমি যদি আগুন জ্বালিতে না জানিতাম..."

রজনী টেবিলের বাতিটা সহসা প্রায় নিবাইয়া ফেলিল। বলিল "দিই—নিবিয়ে দি বাতি।... কেমন আগুন জ্বলে দেখি..."

অষ্টাহ স্বামীকে জ্বালাতন করার কথাটা ইন্দিরা এমন কি মিথ্যা লিখিয়াছিল বুঝিলাম না, বইটা বন্ধ করিলাম।

রজনী পুনরায় অল্পে অল্পে বাতির শিখা বাড়াইল। বলিল "কলেজে পড়তে গিয়ে তুমি খুব পেকে গেছ।"

আমার যে কিছুটা পক্কতা আসিয়াছে সে-বিষয়ে আমার নিজেরও সন্দেহ ছিল না; আপত্তিরও কারণ ছিল না। তবে রজনীর 'খুব' কথাটায় প্রতিবাদ করিতে পারিতাম, করিলাম না। বলিলাম, "নিজে বুঝি কেঁচে গিয়েছ!"

রজনী আমার মাথার চুল ধরিয়া আলগা একটু টান দিল। দুদণ্ড চুপচাপ; রজনী বলিল, "একটু ওঠো।"

উঠিবার প্রয়োজন না থাক বসিবার প্রয়োজন ছিল, উঠিয়া বসিলাম। রজনী বলিল, "বসে থাকলে যে, মাটিতে নেমে দাঁড়াও।"

"কেন!"

"বিছানাটা কি করেছ! ঝেড়ে নি।"

রজনীর উদ্দেশ্য বুঝিবার পক্ষে তাহার চোখের দুষ্ট হাসিটা যথেষ্ট ছিল। বলিলাম, "তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়।"

যেন কিছুই বোঝে নাই, রজনী অবোধের মুখ করিয়া তাকাইবার চেষ্টা করিল।

"এবার আর হবে না।" আমি পা গুটাইয়া বসিলাম।

"কি!"

"পেন্নাম!"

রজনী হাসিয়া ফেলিল। পরে বলিল, "হবে।...ছি, যা করতে হয় তা না করলে চলে!" বলিয়া তাহার মুখ বাঁকা করিয়া চোখ টানিয়া সরস গলায় বলিল, "স্বামী তো! জ্বালাতনের জিনিস।" কথার শেষে রজনী আমার হাত ধরিয়া টানিল।

অগত্যা নামিয়া দাঁড়াইলাম। রজনী প্রণাম করিল। আমি হাসিতেছিলাম।

রজনী শুধাইল, "হাসছ যে!"

"আশীর্বাদ করলুম কি না!"

"উস্ রে আশীর্বাদ!...তা কি আশীর্বাদ করলেন ঠাকুর!"

"মনে মনে করেছি। বলব না।"

"জানি।"

"কি!"

"আমি মরে যাই, তুমি আবার একটা বিয়ে কর।"

"ভাগ্! কি রে!"

"বাঃ! তোমার তো আগে তাই ইচ্ছে ছিল।"

"না, নেভার। ইয়ার্কি কোরো না।"

"এই মিথ্যুক! তুমি বলো নি, বড় হলে আমায় ছেড়ে দিয়ে তুমি আবার বিয়ে করবে।" রজনী চোখে ধমক তুলিয়া মাথা দুলাইয়া কথাটার সত্য সম্পর্কে জবাব চাহিল।

মনে পড়িল, একদা এইরূপ একটা সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিলাম। কিন্তু রজনী মরুক ইহা আমি বলি নাই। কী আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, কথাটা রজনী এখনও মনে রাখিয়াছে। বলিলাম, "সে কখন বলেছি, স্যার। কোন টাইমে। তুমিও তো বলেছিলে পেত্নী হয়ে আমার বউয়ের গলা টিপে দেবে।"

"দেবোই তো।" রজনী যেন এখনও এ-বিষয়ে মত পরিবর্তন করে নাই।

উভয়ে হাসিয়া উঠিলাম।

হাসি থামিল। রজনী বিছানাটা হাত দিয়া পরিপাটি করিতেছিল। তাহার সাজসজ্জায় বেশ কিছুটা যত্ন। কয়েকটি তোলা-অলংকার পরিয়াছে, পায়ে বিছামল, মাথার খোঁপায় সোনার জল-করা কাঁটা। খোঁপাটি বড় মনোহর বাঁধিয়াছে। পরনে নীলাম্বরী।

বিছানাটি নিভাঁজ ও বালিস দুটি নিবিড় করিয়া রাখিয়া রজনী মাথার দিকে গেল। "জল খাবে!"

"না।"

পানের রেকাবি হইতে পান লইয়া কাছে আসিল। "হাঁ করো—"

"রাত্তিরে পান খাব!"

"খাও গো খাও, বউ দিচ্ছে—" রজনীর সরস কণ্ঠস্বরে পরিহাসটি-ই শুধু বাজিল না, তাহার সদ্যোলব্ধ গৃহিণীজাত পরিপক্কতাও প্রকাশ পাইল।

সে আমার মুখে পান ভরিয়া দিল, আমি

চিবাইতে লাগিলাম।

রজনী সরিয়া গেল, আলগোছে সামান্য জল খাইয়া পান মুখে পুরিল।

কিসের যেন একটা স্বাদ আসিতেছে, চেনা অথচ নূতন। পানের রস যতই জিহ্বার সহিত স্বাদটাকে জড়াইয়া লয় ততই যেন মনে হয়, এই স্বাদ আমার অজানা নয়। মুখের ভিতরটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, গন্ধ পাইলাম। পিপারমেণ্ট। রজনীর সেই পিপারমেণ্ট।

রজনীকে দেখিতেছিলাম। কয় মাস পূর্বেও রজনীকে এইরূপ মনে হয় নাই। তাহার গড়নের কোথাও যদি কোনো অপূর্ণতা সেদিন থাকিয়াও থাকে, আজ তাহা পূর্ণ হইয়াছে, যেন প্রতিমার সকল সজ্জা আজ সমাপ্ত।

বিছানার দিকে আসিতে আসিতে রজনী আমার অপলক বিমোহিত দৃষ্টি দেখিয়া মুহূর্তের জন্য থমকাইয়া গেল। চোখে চোখে তাকাইয়া, হঠাৎ বুঝি নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়িয়া সামান্য আড়ষ্ট হইল। বলিল, "ঠাকুরঝি জোর করে সাজিয়ে দিল।" বলিয়া সলজ্জ মুখে বিছানায় গিয়া বসিল। পর মুহূর্তে মুখ তুলিল, "একেবারে সঙ্ সাজিয়েছে, না গো!"

"তুমি আরও সুন্দর হয়ে গেছ।"

"ইস্...খোশামোদি..."

"না, সত্যি। মস্ট্ বিউটিফুল!"

"শোবে না!"

পা পা করিয়া বিছানায় গিয়া বসিলাম।

রজনী আমার কপালের কাছ হইতে চুলগুলি সযত্নে ও সোহাগভরে সরাইয়া দিয়া বলিল, "তোমার ঠোঁট খুব লাল হয়।"

"পান খেলে হয়।"

"হবেই তো। বউ কত ভালবাসে তাই না!" রজনী হাসিয়া ফেলিয়া আমার কাঁধে মুখ লুকাইল।

"আর তোমার মুখে কি সুন্দর গন্ধ হয়... বর ভালবাসে বলেই তো।'

অসহ্য কোনো লজ্জা যেন রজনী সহিতে পারিতেছিল না। আলোর শিখাটি নিবাইয়া দিল। হঠাৎ যেন অন্ধকার আসিয়া আমাদের সমস্ত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একা রাখিয়া গেল।

অন্ধকারে রজনীর হাতের স্পর্শ, শরীরের স্পর্শ, ঘ্রাণ ও নিবিড় সাহচর্যের মধ্যে কখন যেন অনুভব করিলাম, আমার বালিকাবধূটি আজ যৌবনের কুসুমগুলিতে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার এই সদ্য যৌবনের অপরূপ মহিমায় আমার হৃদয়টি নিজের পরিপূর্ণতা অনুভব করিল।

স্ত্রীর মুখচুম্বন করিয়া মৃদু স্বরে ডাকিলাম, "রজনী!"

রজনী সামান্যক্ষণ নীরব থাকিল, পরে বিষণ্ণ গলায় বলিল, "তোমার কলেজে পড়া কবে শেষ হবে?"

"চার...চার বছর পরে।"

"অ—নেক পড়ায়!" এতটা দীর্ঘ পাঠ

রজনীর যেন পছন্দ নয়।

"দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

"কাটে না গো, কাটে না—।"

"আমারও।" সত্য কথাটা স্বীকার করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। অন্ধকারের মধ্যে ভবিষ্যৎ চারিটি বৎসর যেন বড়ই দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল। মনটা দমিয়া গেলেও তাহা প্রকাশ করিলাম না। সান্ত্বনা দিবার মতন করিয়া বলিলাম, "বছরে পাঁচমাস করে ছুটি, বাড়িতে এসেই থাকব তো। তারপর একেবারে এখানে, বরাবর, তোমার কাছে।"

রজনী নীরব। আমার দিকে পাশ ফিরিল। পিপারমেণ্টের গন্ধ-জড়ানো গলায় চাপা স্বরে বলিল, "এখন থেকে আমি এখানেই থাকব।"

১১

আজও রজনী আমার নিকটেই আছে। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সে আমার নিকটেই থাকিয়া গেল। আমরা আর যুবক-যুবতী নয়, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া হইয়াছি। আমার মাথার চুল পাকিয়াছে, দেহটা ভাঙিয়া আসিতেছে; রজনীর সিঁথির কাছটা সিঁদুরে চওড়া হইয়া অনেক চুল উঠিয়া গিয়াছে, কিছু কিছু চুলের রঙ সাদা হইয়াছে, তাহার শরীরে বয়সের একটা স্থূলতা আসিয়াছে. চোখের দৃষ্টি কমিয়া যাওয়ায় চশমা পরে।

দেখিতে দেখিতে জীবনটা শেষ হইয়া

আসিল। সুখে দুঃখে এই রজনীর সহিত এতটা কাল কাটিয়া গেল, পিতাঠাকুর কবে চলিয়া গিয়াছেন মাতাঠাকুরানীও। ভ্রাতাটি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সে এখানে থাকে। কোলিয়ারীতে সার্ভেয়ারী করে। প্রয়োজন খুব একটা ছিল না, তথাপি কাজ বিনা পুরুষের দিন কাটে না বলিয়াই সে সার্ভেয়ারী করিতেছে। আমার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; পুত্র ডাক্তারী পড়া শেষ করিয়া হাতপাতালেই চাকুরি করিতেছে। আমার পিতাঠাকুর আমার কৈশোর-বিবাহ দিয়াছিলেন, আমি অতটা সাহস করি নাই। দিনকালের পরিবর্তন হইয়াছে। চন্দ্রা ও শরৎ-ভায়াও মত দেয় নাই। তথাপি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলাম অষ্টাদশ বৎসরে। পুত্রের বিবাহও দিয়াছি, তবে সম্প্রতি। আমাদের সন্তান কিছু বিলম্বে আসিয়াছিল।

আমার ঘরের বিছানার সামান্যমাত্র পরিবর্তন হইয়াছে। বড় পালঙ্কে আমি একাই শয়ন করি, রজনী পাশে একটি ছোট খাটে ঘুমায়। তাহাকে কতবার বলিয়াছি, 'আমাকে একা ঘরে রাখতে তোমার ভয় করে?' প্রৌঢ়া রজনী কথাটার জবাব দেয় না।

বয়স হইলে ছোটখাট আধিব্যাধি থাকেই। আমার কোনো কোনোদিন ভাল ঘুম হয় না, কোনোদিন বা হাঁপানির টান আসে, কখনও মনে হয় বুকটা বড় চাপ হইয়া আছে। শারীরিক অসুস্থতা বা অস্বাস্তিবশত যদি

বিছানায় উঠিয়া বসি, বা সামান্য উঃ আঃ করি, ঘুমন্ত রজনী বিছানা ছাড়িয়া কাছে আসে। কি করিয়া যে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, বুঝি না। তাহার পর তাহরে শতরকম সেবা ও শুশ্রূষা। রজনীর ঘুম এত পাতলা হইয়া গিয়াছে কেন বুঝি না।

আজও তেমন জ্যোৎস্না ওঠে, জানালার বাহিরে বৃদ্ধ আমগাছটার আর শব্দ হয় না, তাহার পাতায় চাঁদের আলো পড়ে না। উহার মাথাটা এখন নিষ্পত্র, গাছটা কবে যেন মরিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙিলে আমি অতি সাবধানে বিছানার উপর উঠিয়া বসি। বসিয়া বসিয়া চাঁদের আলো দেখি, আম গাছটার কথা ভাবি, নিজের জীবনের কথাও। কোনোদিন দূর প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া থাকি। চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গেলেও চন্দ্রালোকে এতকালের দেখা—মাঠঘাট, গাছ, প্রান্তর সবই আমি অনুমান করিতে পারি। বাহিরের ওই জগৎটা যেন বড় বেশী ব্যাপ্ত তাহার কোথাও সীমানা নাই।

মধ্য রাত্রে চন্দ্রালোকিত শূন্য ও পরিপূর্ণ নিস্তব্ধ চরাচর দেখিতে দেখিতে মনের অনুভূতিটা কেমন যেন হইয়া যায়। অন্ধকার থাকিলে দূরান্তের নক্ষত্রগুলি যেন আমার এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গৃহটির দিকে তাকাইয়া দেখে এবং বোধ করি ভাবে, আমি এতটুকু অল্পে কেমন করিয়া শান্তি পাইলাম।

আমি আজকাল প্রায়শ অনুভব করিতে পারি,

বাহিরের ওই সীমাহীন জগৎটার নৈর্ব্যক্তিক দুটি চক্ষু আমায় যেন অবজ্ঞায় অবলোকন করে। জানি, উহাদের নিকট আমায় যাইতে হইবে, বিশ্বসংসারের অনন্ত ও ব্যাপ্ত শূন্যতার কোথাও আমার সমস্ত অস্তিত্ব এক কণা ধূলির মতনও অস্তিত্বময় হইবে না। আমি নিশ্চিহ্ন মুছিয়া যাইব।...

ঘরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনি; দেখি, আমার সেই বালিকাবধূ "চিনি" আজ প্রৌঢ়া, তথাপি সে আমার পাশে আছে, সে পরম নিশ্চন্তে নিদ্রা যাইতেছে। মনে হয়, আমাদের ঘরটুকু বড়ই পরিমিত ও সংকীর্ণ হইলেও এখানে যত কিছু পাইয়াছি, তাহার পরিমাণ কিছু কম নয়। কি পাইয়াছি তাহা আমি অনুভব করিতে পারি মাত্র, প্রকাশ করিতে পারি না।

বাহিরের অসীম আকাশ, তাহার দূর দূরান্তের নক্ষত্র, তাহার উৎফুল্ল জ্যোৎস্না, ওই দিগন্তব্যাপী প্রান্তর বৃক্ষলতাদি একদা আমায় এই অতিক্ষুদ্র কক্ষ হইতে পরম উপেক্ষায় বাহিরে টানিয়া লইয়া ফুৎকারে বাতাসে মিলাইয়া দিবে। কিন্তু উহারা কোনো দিন বুঝিবে না—তাহাদের বিশ্বব্যাপী শূন্যতার সাধ্য নাই আমায় কিছু দেয়। অথচ এই নিতান্ত নগণ্য এক গৃহকোণে আমার বালিকাবধূ উহাদের সাধ্যাতীত বস্তুগুলিই দিয়াছে।

আমার পিতাঠাকুরকে আমি প্রণাম করি। তাঁহার কৃপায় অনেক পাইয়াছি।